ইক্ষু চাষ।

শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

ইক্ষু চাষ

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ লেকচারার, বাংলার
শাকশব্জী আলু, তুলা, আদা, সরল কৃষি-কথা, বাংলার
মাটী, হরিদ্রা, ইক্ষু, ও পানচাষ, ফসলের খাদ্য,
মৎস্য বিজ্ঞান, কলার চাষ, বেনেতিবাগ,
গোসেবা, কৃষি পঞ্জিকা, ফসলের রোগ
ও তাহার প্রতিকার প্রভৃতি
বহু কৃষিগ্রন্থ প্রণেতা

ডক্টর শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার
প্রণীত

প্রকাশক :—
দি গ্লোব নার্শরী
৬।৫ নং রামধন মিত্র লেন, শ্যামবাজার,
কলিকাতা।

[মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র

প্রকাশক ঃ—

শ্রীঅমরনাথ রায়

দি গ্লোব লাইব্রেরী

৬।৫ নং রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা।

১লা অক্টোবর, ১৯৩১

তৃতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার শ্রীপঞ্চানন বাকৃচি

আই, ডি, প্রেস

৩৮, মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাত

সূচী পত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। ইক্ষুচাষের আবশ্যকতা	...	১
২। ইতিবৃত্ত	...	৪
৩। গুণ	...	৬
৪। ভারতের চিনি শিল্প ধ্বংশের কারণ	...	৭
৫। জাতিভেদ	...	১৩
৬। ভূমি নির্ব্বাচন	...	৭
৭। চারা প্রস্তুতকরণ	...	৩০
৮। রোপণ কাল	...	৩১
৯। রোপণ প্রণালী	...	৩০
১০। মুল রোপণ	...	৪৩
১১। বীজ বপন	...	
১২। রোপণ ও চাষ	...	
১৩। সার প্রয়োগ	...	৩
১৪। কীট ও রোগ নিবারক ঔষধ	...	৩৮
১৫। আবহাওয়া	...	৩৮
১৬। রৌদ্রতাপ ও আর্দ্র বায়ু	...	৩৮
১৭। আখ মাড়া	...	
১৮। চিনির প্রকার ভেদ	...	৫৫
১৯। কাটাই মাড়াই	...	৫৮
২০। বাংলার ৭॥০ কোটি টাকা রক্ষার উপায়	...	৫৯

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এল, সি

(শ্রমিক সদস্য)

দাদা মহাশয়,—

আপনি দীন, দুঃখী, দরিদ্র শ্রমিকের দুঃখ ক্লেশে সর্ব্বদা ম্রিয়মান থাকেন, কলগুলি সহর হইতে দূরে স্থাপিত হইলে, এবং কারখানার সংলগ্ন প্রভূত জায়গা থাকিলে অবকাশ মত সময়ে শ্রমিকেরা কোন চাষ করিয়া লাভবান হইতে পারে এই প্রশ্ন আমায় করিয়াছিলেন; সেই প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা আপনার শ্রীচরণকমলে অর্পিত হইল, ইহারদ্বারা তাহাদের কোন উপকার হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

ইতি —

মাউলী
যশোহর

প্রণতঃ গ্রন্থকার
যামিনীরঞ্জন

ইক্ষু চাষ।

১। ইক্ষুচাষের আবশ্যকতা।

ভারতবর্ষে এখন সর্ব্বসমেত ৪৪টা চিনির কারখানা আছে। এইগুলির মধ্যে প্রায় ৩০টা কারখানায় ইক্ষুরস হইতে চিনি তৈয়ারী হয় এবং অবশিষ্টগুলিতে গুড় হইতে চিনি করা হয়। দোবারা চিনি ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত করা হয় ও ছোট দানার চিনি বা গুড় চিনি সাধারণতঃ গুড় পরিষ্কৃত করিয়া করা হয়। ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে মোট ৫টা কারখানা আছে; অবশিষ্ট সমস্তই যুক্তপ্রদেশে ও বিহারপ্রদেশে অবস্থিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সমস্ত বাঙ্গলাদেশে একটীও চিনির কারখানা নাই। উপরোক্ত কারখানার কয়েকটি ইংরেজ ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক পরিচালিত এতদ্ব্যতীত সবগুলিই ভারতীয় লোকের কর্ত্তৃত্বাধীনে। ভারতের সর্ব্বত্র সমস্ত কারখানার প্রস্তুত চিনির পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ মণ হইবে। ইহা ছাড়া দেশীয় উপায়ে প্রস্তুত চিনির পরিমাণ প্রায় ৫৪ লক্ষ মণ হইবে। তবে দেশীয় উপায়ে প্রস্তুত চিনির পরিমাণ দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে; কেননা, কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অসমর্থ। তথাপি দেশীয় উপায়ে প্রস্তুত চিনি

স্থান বিশেষে (Local market) চলিতে পারে। উপরন্তু সহজ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ও যন্ত্রের (Centrifugal machine) সাহায্য লইলে দেশীয় উপায়ে প্রস্তুত কারখানার সঙ্গে সমানভাবে চলিতে পারে। আমাদের দেশে গুড় বা চিনি প্রস্তুতকরণে বহু-প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া হয়। ইহাতে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শর্করাভাগ বহুলাংশে বিনষ্ট হইয়া যায়। চিনি উৎপাদনদ্বারা লাভবান হইতে হইলে এই ক্ষতি নিবারণ করা একান্ত আবশ্যক। বস্তুতঃ পক্ষে চিনি উৎপাদক-গণের ইক্ষুদণ্ড হইতে রস লইয়া সরাসরি চিনি প্রস্তুত করাই উচিত।

বাঙ্গালা দেশে আজকাল প্রায় দুই লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। কিন্তু এই ইক্ষুর ক্ষেত্র এত বিক্ষিপ্ত যে, কোন কারখানার পক্ষে প্রয়োজনীয় ইক্ষু পাওয়া অসম্ভব। যানবাহনাদিরও অনেক অসুবিধা। কারখানা স্থাপিত হইলে চাহিদা বাড়িলেই ইক্ষু চাষের পরিমাণও অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আজকাল চাষীরা পাট চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। লাভজনক বুঝিতে পারিলে চাষীরা পাটের পরিবর্ত্তে ইক্ষুচাষই করিবে। বাঙ্গলা দেশে কারখানা স্থাপিত করিতে হইলে কারখানার উপযোগী উহার সংলগ্ন ইক্ষুক্ষেত্র থাকা আবশ্যক। বাঙ্গলা দেশে একরপ্রতি ৩০০ মণ ইক্ষু পাওয়া যায়, ইহা নিতান্তই কম। একর প্রতি ৬০০।৭০০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন করা কঠিন নহে। উন্নততর ইক্ষুচাষে এইপরিমাণ ইক্ষু পাওয়া

যায়—যেমন আজকাল যুক্তপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলে উৎপন্ন হইতেছে। জাভা দেশে একর প্রতি এক হাজার মণ ইক্ষু উৎপন্ন করা হয়। এই বিষয়ে সরকারী কৃষিবিভাগের সাহায্য প্রয়োজন। যুক্তপ্রদেশের কৃষি বিভাগ এই বিষয়ে প্রতিবৎসর বহু টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন ও অন্যান্য অনেক উপায়ে ইক্ষুচাষের সাহায্য করিয়া থাকেন।

বাঙ্গলাদেশে রাজসাহী, বগুড়া ও রংপুর প্রভৃতি জেলায় প্রচুর ইক্ষুচাষ হয় ও গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ইক্ষু চাষের পরিমাণ অনায়াসে আরও বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। এইসব অঞ্চলে অনায়াসে ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করিয়া গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। দুই তিনটি গ্রাম লইয়া এক একটী কেন্দ্র করিয়া অল্প মূলধনে ছোট ছোট কারখানা করা যাইতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে, রসায়নের দিকই ইহার সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন। চিনি-রসায়ন জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রথমতঃ সাহায্য লওয়া আবশ্যক। দক্ষহস্তে পরিচালিত হইলে লোকসানের কোনই হেতু নাই।

সম্প্রতি টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে সরকার আমদানি চিনির উপর মণ প্রতি ৭।০ টাকা শুল্ক ৭ বৎসরের জন্য ধার্য্য করিয়াছেন। আমদানি চিনির পরিমাণ প্রায় ২৭০ লক্ষ মণ; আর আমাদের ভারতে প্রস্তুত চিনির পরিমাণ হইতে সহজেই অনুমেয় যে দেশীয় চিনির পরিমাণ আরও দশগুণ বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। এই সুযোগ লইয়া বাঙ্গালীগণ অবিলম্বে চিনি

প্রস্তুত বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করুন এবং দেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার করতঃ দেশের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি করুন। মনে রাখিতে হইবে, অধ্যবসায় ও সততা দ্বারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যতই প্রতিকূল হউক না কেন, আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি। বাঙ্গালীর বুদ্ধি অতুলনীয়, ব্যবসায়বুদ্ধি বাঙ্গালীর নাই, ইহা অত্যন্ত মারাত্মক ভ্রম। আজকাল শিক্ষিত যুবকের অভাব নাই, তাঁহারা এই বিষয়ে অগ্রণী হইলে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবেন, সেই সঙ্গে অর্থবানের মূলধন যোগান অবশ্য কর্ত্তব্য।

২। **ইতিবৃত্ত**—Saccharum officinasum নানা জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন হয়। আরবী পারসীতে চিনির নাম শক্কর, গ্রীকে সাকেরণ (Sakcharon), সংস্কৃতে শর্করা; এবং ইংরাজীতে সুগার (Sugar) নাম শর্করারই অপভ্রংশ। সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষে ইক্ষুচিনির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপরে চীন, পারসীক, আরব ও রোমান জাতিরা ইহার তথ্য অবগত হয়। কথিত আছে, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের (Alexander) দিগ্বিজয় কালে গ্রীকেরা ভারতবর্ষে আগমন করিলে সর্ব্বপ্রথম বৃক্ষদণ্ডের (ইক্ষুদণ্ড) মধ্যে মধুর ন্যায় মিষ্ট রস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। সম্রাট নিরোর রাজত্বের অনেক পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জাতীরা চিনির ব্যবহার করিত, কিন্তু বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইংরাজেরা চিনির অধিক ব্যবহার করিত না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভিনিসই (Venice) ইয়ুরোপের প্রধান চিনির বন্দর ছিল।

ইক্ষু, বিট, খর্জ্জুর, তাল, আরেঙ্গা (Aranga), ক্যারিওটা

(Caryota), নারিকেল, মহুয়া, মেপ্‌ল, (Acer), ভুট্টা, নীল এবং নিম্ব প্রভৃতি উদ্ভিদ্ হইতে চিনি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে চিনির উৎপন্নের পরিমাণ অল্প। অধুনা, ইক্ষু পৃথিবীর সকল দেশেই জন্মিতেছে; তন্মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ (West Indies), জামেকা (Jamaica), দক্ষিণ আমেরিকা (South America), ডেমারারা (Demarara) ফিজি (Fiji), জাভা (Java), প্রণালী উপনিবেশ (Strait Settlement), মরিসাস (Mauritius), প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক ধনী কোম্পানী ব্যবসায় হিসাবে ইহার প্রচুর চাষ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ, পারস্য, (Persia), মিশর (Egypt), গ্রীস (Greece), ইতালি (Italy), ফ্রান্স (France), স্পেন (Spain), আমেরিকা (America), জাপান (Japan), চীন (China), ব্রহ্ম (Burma), প্রভৃতি দেশে যে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায়ই তত্তৎ দেশীয় অধিবাসীদিগের ব্যবহারেই পর্য্যবসিত হয়, অন্য কোন দেশে অধিক পরিমাণে রপ্তানি হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে আজকাল ইহার বিপরীত হইতেছে। ফ্রান্স(France), জার্ম্মানী(Germany) নেদারল্যাণ্ড (Netherland) ও অষ্ট্রীয়াতে(Austria)প্রচুর পরিমাণ বিট চিনি উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে ইক্ষু ব্যতীত খর্জ্জুর, তাল, নারিকেল বৃক্ষ হইতেও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে খর্জ্জুর চিনির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মহুয়া এবং নিম্ব হইতে চিনি বাহির হইলেও তাহার পরিমাণ অতি সামান্য; কেবল মাত্র মদ্য ও ঔষধের নিমিত্ত হইয়া থাকে। এ দেশের খর্জ্জুরের

ন্যায় সিংহলে ক্যারিওটা ইউরেন্স্ (Caryota urens) এবং আন্দামান ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে আরেঙ্গা স্যাকারীফেরা (Arenga Saccharifere) নামক তাল জাতীয় দুই প্রকার এবং আমেরিকা ও জাপানে মেপ্‌ল (Maple Acer) নামক উদ্ভিদ হইতেও চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ জাতীয় মেপ্‌ল জন্মে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহাদের ভিতর হইতে চিনি বাহির করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। এই সকল উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। এজন্য ব্যবসায় হিসাবে ইহাদের চাষ লাভজনক নহে।

৩। গুণ—সর্ব্বপ্রকার চিনির মধ্যে ইক্ষু চিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নির্দ্দোষ, ও স্বাস্থ্যের কোনরূপ হানিকর নহে। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইক্ষুরস, গুড় (মৎসণ্ডিকা), পাটালি, ফানিত (বাতাসা), খণ্ড, শর্করা, সিতোপলা (মিছরি) প্রভৃতি এই কয়েকটী ইক্ষু-বিকার উত্তরোত্তর গুণাধিক, পিত্তনাশক ও বলকর। চিনি বলিলেই আদিম উপায়ে প্রস্তুত শুভ্র দলুয়া চিনিই বুঝিতে হইবে। আমরা আজকাল যে শুভ্র দানাদার বিলাতী আমদানী বিট বা ইক্ষু চিনি ব্যবহার করি, তাহার মিষ্টত্বও কম, অধিকন্তু তাহারা শরীরের পক্ষে অপকারক। আধুনিকেরা আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করিতে চাহেন না, সুতরাং বিলাতী প্রমাণই উদ্ধৃত হইল, পাঠক তদ্দৃষ্টে দানাদার শুভ্র চিনির অপকারিতা বুঝিতে পারিবেন। H. Drury (ড্রুরি সাহেব) তাঁহার গ্রন্থে লিখিতেছেন—"Sugar when simply sucked

from the canes is highly nutritious. The alimentary properties of sugar are much lessened by crystallisation. The common brown sugar is more nutritious than what has been refined.—To persons disposed to dyspepsia and bilious habits sugar in excess becomes more hurtful than otherwise." এ স্থলে Brown sugar অর্থে খাঁড় গুড় ও শৈবালাদি পরিষ্কৃত শর্করাই বুঝিতে হইবে; দন্ত-নিষ্পীড়িত ইক্ষুরস পানই সর্ব্বাপেক্ষা বলকারক।

৪। ভারতীয় চিনি-শিল্প ধ্বংসের কারণ—

অতি প্রাচীন কাল হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়পাদ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ স্বীয় আবশ্যকমত চিনি উৎপাদন করিয়াও অতিরিক্ত অংশ বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে। কিন্তু বিগত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে বিদেশী সুলভ চিনি আমদানী হইয়া, দেশীয় চিনিকে বাজার হইতে বিতাড়িত করতঃ দেশীয় ইক্ষুর চাষ ও চিনির ব্যবসায় লোপপ্রায় করিবার উপক্রম করিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—

১। আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ও সৌখীন হইয়াছি, দেশীয় দলুয়া বা খাঁড় গুড়ে আমাদের তৃপ্তি হয় না; সুতরাং দানাদার সাদা চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২। ইক্ষুদণ্ড হইতে রস নিষ্পাড়ন, এবং গুড় ও চিনি

প্রস্তুত কালে পূর্ব্বতন অনুন্নত উপায়াবলি অনুসৃত হওয়ায় অনেক পরিমাণ চিনি নষ্ট হইয়া যায়; এজন্য চিনির পরিমাণ অল্প হয় অথচ খরচা অধিক পড়ে; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞান-সম্মত উন্নত প্রণালী অবলম্বিত হওয়ায়, রসে চিনির ভাগ নষ্ট হইতে পায় না; সুতরাং চিনি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ যন্ত্রবলে বৈদেশিক চিনির কারখানা চালিত হওয়ায় খরচা কম পড়ে, এজন্য স্বল্পমূল্যে বৈদেশিক চিনির আমদানী বাড়িতেছে।

৩। জার্ম্মানির রহিত-শুল্ক ও রাজসাহায্য প্রাপ্ত—(Boun tyfed) বিট চিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে বাজারে বিক্রীত হওয়াতে, ভারতের চিনি ত গিয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে মরিসাসের ইংরাজি চিনির ব্যবসাও অবসন্ন হইয়াছে। তবে লর্ড কার্জ্জনের নূতন শুল্ক নিয়ম (Countervailing duty) প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জার্ম্মানীর বিট চিনির আমদানী রোধ হইলেও আবার মরিসাস ও জাভা চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। বরং এস্থলে স্বল্পমূল্য বিট চিনির আমদানীতে ভারতের কিছু লাভ আছে; কিন্তু এই নূতন শুল্ক নির্দ্ধারণে ভারতের ক্ষতিই হইয়াছে। যদি মরিসাস বা জাভা চিনির উপর অতিরিক্ত মাশুল বসে, তবেই ভারতীয় ইক্ষুব চাষ ও চিনির কারবার উন্নতি লাভ করিতে পারিবে নচেৎ নহে।

৪। বৈদেশিক চিনি মাত্রই কোমলদণ্ড, স্থূল ও মিষ্টরস-বহুল ইক্ষু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং অল্পব্যয়ে অধিক উৎপন্ন হয় বলিয়া ভারতীয় অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রীত

হয়। শামসাড়া, হেমজা, পুণ্ড্রী প্রভৃতি দেশীয় ইক্ষু এইরূপ মিষ্ট ও রসবহুল। সম্ভবতঃ ইহাদের চাষ বৃদ্ধি করিতে পারিলে দেশীয় চিনির ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে।

আজকাল একটী জল্পনা উঠিয়াছে যে, ভারতীয় ইক্ষু বিদেশীর তাড়নে অবসন্নপ্রায় হইয়াছে, ইহার চাষ লোপের বিলম্ব নাই; সুতরাং বিদেশ হইতে নূতন বীজ আনাইয়া চাষ করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের জানা উচিত, বিগত ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া বঙ্গ ও বিহার প্রদেশে নানা জাতীয় বিদেশী ইক্ষু পরীক্ষিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু পরীক্ষা এখনও সফল হয় নাই, কদাচিৎ ২।১টী জাতি কষ্টে স্বষ্টে জীবন ধারণ করিতেছে। কিন্তু উন্নত উপায়ে চাষ করিতে পারিলে বিদেশী ইক্ষুর সমকক্ষতা করিতে পারে—বিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্য মধ্যে এমন অনেক জাতীয় উৎকৃষ্ট ইক্ষু আছে। আমাদিগকে কেবল উক্ত কয়েকটী কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইক্ষুর উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারণ এবং গুড় ও চিনি প্রস্তুতের উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কিছু সখের মায়াও কাটাইতে হইবে; তাহা হইলে আর আমাদিগকে অখাদ্য বিলাতী চিনির জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে না, অপিচ আমরা বিদেশে চিনি পাঠাইতেও সমর্থ হইব। কীট, পতঙ্গ, উই, হাজা, শুকা, নানাবিধ রোগ ও অনুর্ব্বর ভূমিতে রোপণ প্রভৃতি বিবিধ কারণে বিদেশী ইক্ষুর চাষ এদেশে সফল হয় নাই, পরীক্ষা করিতে করিতে যদি কোন উৎকৃষ্ট জাতীয় বৈদেশিক ইক্ষু এদেশে সাত্মং হইয়া যায়, তবে তদ্দ্বারা উপকার হইতে

পারে। কিন্তু তাহার আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বিদেশী আশা বৃথা। যদি কিছু হয় ত দেশী হইতেই হইবে।

ইক্ষু—শর, খাগড়া ইত্যাদির ন্যায় জলাভূমির উদ্ভিদ। শত ভাগ সরস ইক্ষুদণ্ড শুষ্ক করিলে ২৫ ভাগ দৃশ্যমান সৌত্রিক পদার্থ (Arborous matter) পাওয়া যায়। এজন্য ইহার চাষে জলই প্রধান আবশ্যক বুঝিতে হইবে। ইক্ষুর চাষ সফল করিতে হইলে বৃহৎ জলাশয়, নদী, বিল বা ইন্দারা প্রভৃতি সমীপে স্থান নির্ব্বাচন করা উচিত। জলাভাব ঘটিলে রোপণের দিবস হইতে প্রতি সপ্তাহে ২।৩ বার করিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত জল সেচন করিতে পারিলে ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। ইক্ষু জলাভূমির গাছ হইলেও মানব ইহার মিষ্ট আস্বাদ পাইয়া ইহাকে ইচ্ছানুযায়ী নানা দেশে ও নানা অবস্থায় চাষ করিয়া প্রচুর উন্নতি লাভ করিয়াছে। কোথাও কোথাও বিশেষ উন্নত প্রণালী মতে উৎপাদিত হইয়া ইহা এরূপ রূপান্তরিত হয় যে, তখন আর ইহাকে পূর্ব্বতনদিগের বংশধর বলিয়া জ্ঞান হয় না। তখন সে তাহার আদি জন্ম স্থানে আর কোনরূপে জন্মিতে চাহে না। জন্মিলেও সহসা দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া ইহার মৃত্যু হয়। এই কারণ বশতঃই বিদেশী ইক্ষুর চাষ এ দেশে সফল হয় নাই। মরিসাস, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও জাভার ইক্ষু ভারতবর্ষজাত হইলেও, বিগত ২০০ বৎসরের মধ্যে ঐ সমস্ত স্থানে এরূপ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, এদেশের জল বায়ু

এখন তাহাদের অসহ্য। তবে বিভিন্ন প্রকৃতি, ঋতু ও স্থানীয় অবস্থায় ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও, কালে ইহাদের চাষ সফল হইতে পারে। মানব ইহাকে আবার এরূপ প্রকৃতি দ্বন্দ্বসহ করিয়াছে যে, কি উচ্চ, কি নিম্ন, কি সরস, কি নীরস কি এঁটেল (clay), কি চিক্কন (deep loam), কি দোয়াঁশ, কি বালিয়াঁশ সকল প্রকার ভূমিতে নানা জাতীয় ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। অত্যন্ত সরস ও নিম্ন হইতে উচ্চ ও মধ্যম নীরস ভূমির উপযোগী ভেদে ইক্ষু সাধারণতঃ দুই প্রকার। ইহারা কোমল ও দৃঢ়ত্বক ভেদেও তদ্রূপ দ্বিবিধ। শুষ্ক ভূমিজাত ইক্ষু স্বতঃই কঠিন, স্বল্পকায় ও স্বল্পরস হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন এরূপ জাতীয় ইক্ষুতে চিনির অংশ অধিক থাকে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইক্ষু যতই কোমল বা দৃঢ়ত্বক হউক না কেন, রসে শর্করার পরিমাণ উভয়েরই প্রায় সমান। এজন্য যে জাতি হইতে অধিক পরিমাণ রস পাওয়া যাইবে তাহা হইতেই অধিক চিনি জন্মিবে; এবং যাহার ত্বক যত কোমল সে তত রসপূর্ণ। স্থূল ও বৃহৎকায়, কীট এবং রোগাদি কর্ত্তৃক অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় ইক্ষু এইরূপ কোমল ও বৃহৎ-কায় যে, তাহাতে জলের অংশ অত্যন্ত অধিক, মিষ্ট সামান্য মাত্র; সুতরাং ইহারা ফলমূলাদির ন্যায় খাইবার উপযুক্ত। যে জাতীয় ইক্ষু কোমলত্বক ও স্থূলকায় এবং যাহার অভ্যন্তরে ছিবড়ার ভাগ (fibrous matter) অল্প, তাহা হইতেই অধিক পরিমাণ রস পাওয়া যায়। অর্থাৎ ছিবড়া যত অধিক থাকিবে

রসও সেই অনুপাতে অল্প হইবে। ওটাহিঠি (Otaheite) ও দেশীয় ইক্ষুর বিশ্লেষণে এই কথাটী বিলক্ষণ প্রমাণিত হয়। ইহাতেই বুঝা যায় বৈদেশিক ইক্ষু হইতে চিনি কেন অধিক জন্মে।

	ওয়াহিটীর ইক্ষু	দেশীয় ইক্ষু
জল (water)	৭২	৬৬
চিনি (suger)	১৮	১৭½
ছোবড়ার ভাগ (fibrous matter)	১০	১৬½
	১০০	১০০

দৃঢ়ত্বক ও ছিবড়া বহুল ইক্ষুর রস কিছু অল্প হইলেও ইহারা সাধারণতঃ কঠিন প্রাণ, স্বল্পরোগ ও অল্প কীটপ্রবণ; সুতরাং ইহাদের মধ্যে যাহা অধিক রসপূর্ণ ও কলে চড়াইলে স্বল্পায়াসেই যাহা হইতে অধিক রস নির্গত হয়, তাহাই লাভজনক চাষের উপযোগী বুঝিতে হইবে। কারণ কোমলত্বক্ ইক্ষু রোগ ও কীট-প্রবণ হওয়ায় অনেক সময় ক্ষেত্রের গাছ উজাড় হইয়া যায়। আবার অনেকে সখ করিয়াও চুরি করে। তাহার উপর শৃগাল, বরাহ, ভল্লুক, হাতী প্রভৃতি বন্য জন্তুর উপদ্রব আছে সুতরাং চাষে বিস্তর ক্ষতি হয়। কিন্তু দৃঢ়ত্বক জাতিতে এ সকল কোন দোষ না থাকায়, চাষে অল্প ক্ষতি হয়, লাভ সমানই থাকে, অথচ পরিশ্রম বা ব্যয়বাহুল্য নাই এজন্য অনেকে দৃঢ়ত্বক্ জাতীয় ইক্ষু রোপণের পক্ষপাতী।

৫। **জাতিভেদ**—ভারতবর্ষে বহু জাতীয় ইক্ষু জন্মে। তাহাদের মধ্যে বহু পরিমাণ রস উৎপাদনকারী দৃঢ়ত্বক-জাতীয় ইক্ষুও বিস্তর দেখা যায়। চিনির ব্যবসায়ে উন্নতি ও বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে, চাষের নিমিত্ত আমাদিগকে এই সকল বিশিষ্ট জাতির পরিচয় লইতে হইবে; পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে ভারতবর্ষীয় ও প্রসঙ্গক্রমে বিদেশীয় নানাবিধ উৎকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষুর বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি চাষের বিশেষ উপযোগী বুঝিতে হইবে।

কাজলা—শুষ্ক দোয়াঁশ ভূমিতে ভাল জন্মে, চাষে জলসেচনের আবশ্যক হয়। এই জাতীয় ইক্ষু বেগুনে রংএর, দৃঢ়ত্বক বটে, কিন্তু শামসাড়া অপেক্ষা কিছু কোমল ও ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। রসের পরিমাণ অল্প হইলেও মিষ্টতা অধিক; ইহা হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় গুড় উৎপন্ন হয়। নিলের সিটী, গোময়াদি পশুবিষ্ঠা ও উদ্ভিজ্জসারে ইহা ভাল জন্মে। নদীয়া, যশোহর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বিস্তর কাজলা আখের চাষ হইয়া থাকে। বিঘাপ্রতি ১৫।২০ মণ গুড় উৎপন্ন হয়।

কাজলী—রাজসাহী জেলায় এই ইক্ষু জন্মে। নাম কাজলী খাগড়া। বর্ণ লালচে, অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক ও সরুজাতীয়; দৈর্ঘ্যে ৪ হস্ত। সরস দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে সুন্দর বর্দ্ধিত হয়। রাজসাহী জেলার অনেক স্থানে বিনা সারেই এই ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ১৪।১৫ মণ গুড় পাওয়া যায়।

ইহা কাজলারই প্রকারভেদ। দক্ষিণ বিহার অঞ্চলেও উচ্চ ভূমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে।

খড়ি—এই জাতীয় ইক্ষু বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে জন্মে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অল্প রোগপ্রবণ। বর্ণ সবুজের উপর সাদাটে, পাকিলে ফিকা হরিদ্রাবর্ণ। ইহা কঠিনপ্রাণ (Hardy), ঈষৎ সুস্থকায় ও শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক বলিয়া সহজে রোগ বা কীটাক্রান্ত হয় না। ৪।৫ বৎসরকাল সমভাবে ফলিয়া থাকে এবং উচ্চ দোয়াশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। ইহার রসে মিষ্টতা অধিক, বিঘা প্রতি ১৫।২০ মণ উৎকৃষ্ট গুড় উৎপন্ন হয়। বর্দ্ধমান পরীক্ষাক্ষেত্রে কয়েক বৎসরের পরীক্ষায় বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ও লাভজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ধলসুন্দর—কেহ কেহ ঢালাসুন্দরও বলিয়া থাকেন, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে অল্পবিস্তর চাষ হইয়া থাকে। গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। সাদাটে বর্ণ। সরল দোয়ঁাশ মৃত্তিকায় ভাল জন্মে। ইহা হইতে উত্তম গুড় উৎপন্ন হয়।

ইখড়ী—ফরিদপুর অঞ্চলে জন্মে। বর্ণ শ্বেতাভ হরিৎ। অত্যন্ত কঠিনত্বক; দুই হাত জলে ডুবিয়া থাকিলেও গাছ মরে না। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ বালির দানার ন্যায় শুষ্ক গুড় পাওয়া যায়।

খাগী—পূর্ব্ববঙ্গে ইহা নিম্ন জলাভূমিতেই জন্মিয়া থাকে।

কুলোড়—বঙ্গদেশের অনেক স্থানে পূর্ব্বে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইত! সরস ও অত্যন্ত নিম্ন ভূমিতেই ভাল জন্মে। বর্ণ মেটে খড়ি রং, গাছ ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ ও সরু জাতীয় এবং ঘন সন্নিবিষ্ট গ্রন্থিপূর্ণ। বিঘা প্রতি ৮।১০ মণ উত্তম গুড় পাওয়া যায়।

শামসাড়া—উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। ফিকা হরিদ্রা বর্ণ, মোটা জাতি, দৃঢ়ত্বক। ত্বকের কোন অংশ এক প্রান্ত হইতে টানিলে সমস্তটী গাঁট শুদ্ধ সহজেই উঠিয়া আইসে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। পুড়ী ইক্ষুর ন্যায় ইহা হইতে প্রচুর রস পাওয়া যায়। রসে মিস্টতা অধিক, উৎকৃষ্ট জাতীয় গুড় জন্মে। রেড়ীর খইল, গোময় ও গোমূত্র সারে ইহার ফলন অধিক হয়। প্রথমে বিঘা প্রতি ৩০।৪০ মণ গোবর দ্বারা ভূমি প্রস্তুত করিতে হইবে। পশ্চাৎ যেমন গাছ বাড়িতে থাকিবে, ততই নিড়ানি করিয়া প্রত্যেক নিড়ানির সময় চূর্ণিত খইল গাছের গোড়ায় মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপ মিশাইয়া দিয়া আবশ্যকমত জল সেচন করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন—যে তিনি বিঘা প্রতি শামসাড়া ইক্ষুর পাকী ৬০ মণ গুড় পাইয়াছেন; বস্তুতঃ শামসাড়া যদি এতাদৃশ অধিক ফলন হয়, তাহা হইলে ইহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষু; কারণ বৈদেশিক রসবহুল ইক্ষু হইতে গড়ে একর প্রতি ৬ টনের উপর গুড় পাওয়া যায় না (এক একর প্রায় তিন বিঘা জমি; এক টন ২৭½ মণ)। এত পরিমাণ ফলন না

হউক সাধারণতঃ সার দিয়া রীতিমত চাষ করিতে পারিলে শামসাড়ায় বিঘা প্রতি ৪০ মণের উপর গুড় পাওয়া যায় ইহা প্রত্যক্ষ। ইহার চাষ বিশেষ লাভজনক; আমাদের দেশে শামসাড়ার নিম্নে কাজলা ও খড়ি ইক্ষু পরিগণিত হয়।

পুড়ী—শাস্ত্রে ইহার নাম পৌণ্ড্রক্ষু, বঙ্গদেশের মধ্যে সব্জী চাষে পুঁড়োদের ন্যায় কেহ উৎকর্ষ দেখাইতে পারে না। সম্ভবতঃ মালদহের পুঁড়ো (পৌণ্ড্রক) জাতিরাই ইহার উন্নতি সাধন কর্ত্তা। এজন্য ইহার পুঁড়ী নাম হইয়াছে। রং ফিকা হরিদ্রা, পাকিলে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ। ত্বক অত্যন্ত কঠিন নহে। স্থূলকায় ও রস বহুল এবং প্রচুর সারযুক্ত সরস ভূভাগেই ভাল-রূপ জন্মে। বিঘাপ্রতি ২০ মণেরও উপর গুড় পাওয়া যায়। সাহারাণপুর অঞ্চলে, এইজাতীয় পুড়ী বা পুণ্ডা নামক একপ্রকার ইক্ষু জন্মে, তাহা সাধারণতঃ ৮ হাতের উপর দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হয়। অনেকে এই জাতীয় ইক্ষু, গুড় অপেক্ষা খাইবার নিমিত্ত মনোনীত করেন।

পুরাকুহিয়া—আসামে সাদা ও লালচে বর্ণের এতন্নামক দুই প্রকার ইক্ষু জন্মে। ইহারা কোমলত্বক ও স্থূলাকায়। কাঁচা খাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সাধারণতঃ বাড়ীতে লোকে সখ করিয়া রোপণ করে; সরস দোয়াঁশ মাটিতে ভাল জন্মে ও একই ভূমিতে একাধিকক্রমে ১০।১২ বৎসর জীবিত থাকে। এই জাতীয় ইক্ষু ১২ হস্তের উপর দীর্ঘ হয়। পাব ৬।৭ ইঞ্চি দীর্ঘ ও অত্যন্ত স্থূল, ব্যাস প্রায় ২½ ইঞ্চি।

সুন্দর জন্মে এবং প্রচুর জল সেচনের আবশ্যক হয়। এতদুৎপন্ন গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়।

লাল গেণ্ডা—গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। রক্তবর্ণ কোমলত্বক ও স্থূলকায়, কিন্তু তত দৃঢ়প্রাণ নহে। বেতিয়া, চম্পারণ অঞ্চলে উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ইহার চাষ হইয়া থাকে ইহা হইতে সুন্দর গুড়ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে গুড় অপেক্ষা কাঁচা খাইবার জন্য ইহার অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

ধাউর ও মাতনা—এই দুই জাতীয় ইক্ষু সাজাহানপুর অঞ্চলে প্রচুর উৎপন্ন হয়। গাছ ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ ও কঠিন-প্রাণ, এঁটেল মাটিতে ভাল জন্মে। প্রচুর জল সেচনের আবশ্যক হয়। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ গুড় পাওয়া যায়। ইহার রসে উৎকৃষ্ট মিছরী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দিকুচর—সাজাহানপুর অঞ্চলে উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে। গাছ ৭।৮ হস্ত দীর্ঘ হয়; স্থূলকায় ও কোমলত্বক; এজন্য কীটাদি কর্ত্তৃক শীঘ্রই আক্রান্ত হয়। ইহার চাষ সুবিধাজনক নহে।

শিবারি—গোরক্ষপুর অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হয়। এঁটেল নিম্নভূমিতেই সুন্দর জন্মে। গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। বর্ণ ফিকা সবজা হলদে, অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক ও সরু জাতীয়। ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণ রস পাওয়া যায় এবং উৎকৃষ্ট শুষ্ক গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। নিম্নভূমির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

কিন্তু মিষ্টের ভাগ অল্প। অত্যন্ত বিলম্বে বৃদ্ধি পায়। নাগপুর অঞ্চলে ইহার চাষ হয়।

পানশাহী—গাছ ৪।৫ হস্তের উপর দীর্ঘ হয় না। বর্ণ সাদাটে, সরু জাতীয় ও অত্যন্ত কঠিন প্রাণ। অত্যন্ত উর্ব্বরা ও উচ্চ ভূমিতেই ভাল জন্মে। বিঘাপ্রতি ১৫।১৬ মণ গুড় পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাকী গুড়ের জন্য ইহার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে; ইহার চাষে লাভ আছে। বাদসাহ-দিগের পানের নিমিত্ত ইহার চাষ হইত, এজন্য পানসাহী নাম হইয়াছে।

রেঙ্গা—গাছ ৪।৫ হস্ত দীর্ঘ হয়। হরিদ্রা বর্ণ, পাকিলে পাঁশুটে রং ও অপেক্ষাকৃত মোটা জাতীয়, উচ্চ দোয়াঁশ ভূমিতে ভাল জন্মে। বিহারে পশ্চিমাঞ্চলস্থ দেশসমূহে ইহা হইতে উৎকৃষ্ট সার গুড় প্রস্তুত হয়। ইহার চাষ লাভজনক।

মাঙ্গা—ত্রিহুতের পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বত্রই ইহার প্রচুর চাষ হয়। গাছ ৪।৫ হাত উচ্চ হয়। মধ্যম কোমলত্বক ও মোটা জাতীয়; উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে এবং নিতান্ত নীরস ভূমিতেও সহজে মরে না। কিন্তু সহজেই কীটাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহা দানাদার চিনি প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ গুড় পাওয়া যায়।

ভুর্লী—বিহার অঞ্চলে ইহার প্রচুর চাষ হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত রেঙ্গা ও পানশাহীর মত; তবে দৈর্ঘ্যে আরও বর্দ্ধিত হয়। পত্রও কিছু বৃহত্তর ও কঠিন-প্রাণ। উচ্চ চিকন মৃত্তিকাতে

সুন্দর জন্মে এবং প্রচুর জল সেচনের আবশ্যক হয়। এতদুৎপন্ন গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়।

লাল গেণ্ডা—গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। রক্তবর্ণ কোমলত্বক ও স্থূলকায়, কিন্তু তত দৃঢ়প্রাণ নহে। বেত্তিয়া, চম্পারণ অঞ্চলে উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ইহার চাষ হইয়া থাকে ইহা হইতে সুন্দর গুড়ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে গুড় অপেক্ষা কাঁচা খাইবার জন্য ইহার অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

ধাউর ও মাতনা—এই দুই জাতীয় ইক্ষু সাজাহানপুর অঞ্চলে প্রচুর উৎপন্ন হয়। গাছ ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ ও কঠিন-প্রাণ, এঁটেল মাটিতে ভাল জন্মে। প্রচুর জল সেচনের আবশ্যক হয়। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ গুড় পাওয়া যায়। ইহার রসে উৎকৃষ্ট মিছরী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দিকুচর—সাজাহানপুর অঞ্চলে উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে। গাছ ৭।৮ হস্ত দীর্ঘ হয়; স্থূলকায় ও কোমলত্বক; এজন্য কীটাদি কর্তৃক শীঘ্রই আক্রান্ত হয়। ইহার চাষ সুবিধাজনক নহে।

শিবারি—গোরক্ষপুর অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হয়। এঁটেল নিম্নভূমিতেই সুন্দর জন্মে। গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। বর্ণ ফিকা সবজা হলদে, অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক ও সরু জাতীয়। ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণ রস পাওয়া যায় এবং উৎকৃষ্ট শুষ্ক গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। নিম্নভূমির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

কিন্তু মিষ্টের ভাগ অল্প। অত্যন্ত বিলম্বে বৃদ্ধি পায়। নাগপুর অঞ্চলে ইহার চাষ হয়।

পানশাহী—গাছ ৪।৫ হস্তের উপর দীর্ঘ হয় না। বর্ণ সাদাটে, সরু জাতীয় ও অত্যন্ত কঠিন প্রাণ। অত্যন্ত উর্ব্বরা ও উচ্চ ভূমিতেই ভাল জন্মে। বিঘাপ্রতি ১৫।১৬ মণ গুড় পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাকী গুড়ের জন্য ইহার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে; ইহার চাষে লাভ আছে। বাদসাহ-দিগের পানের নিমিত্ত ইহার চাষ হইত, এজন্য পানসাহী নাম হইয়াছে।

রেঙ্গা—গাছ ৪।৫ হস্ত দীর্ঘ হয়। হরিদ্রা বর্ণ, পাকিলে পাঁশুটে রং ও অপেক্ষাকৃত মোটা জাতীয়, উচ্চ দোয়াঁশ ভূমিতে ভাল জন্মে। বিহারে পশ্চিমাঞ্চলস্থ দেশসমূহে ইহা হইতে উৎকৃষ্ট সার গুড় প্রস্তুত হয়। ইহার চাষ লাভজনক।

মাঙ্গা—ত্রিহুতের পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বত্রই ইহার প্রচুর চাষ হয়। গাছ ৪।৫ হাত উচ্চ হয়। মধ্যম কোমলত্বক ও মোটা জাতীয়; উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে এবং নিতান্ত নীরস ভূমিতেও সহজে মরে না। কিন্তু সহজেই কীটাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহা দানাদার চিনি প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ গুড় পাওয়া যায়।

ভুর্লী—বিহার অঞ্চলে ইহার প্রচুর চাষ হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত রেঙ্গা ও পানশাহীর মত; তবে দৈর্ঘ্যে আরও বর্দ্ধিত হয়। পত্রও কিছু বৃহত্তর ও কঠিন-প্রাণ। উচ্চ চিকন মৃত্তিকাতে

কলে এদের ভাঙ্গা শক্ত, দুফালি করে ভাঙ্গতে হয়। একটা টিকলী (cutting) লাগালে তার গোড়া দিয়ে গাছ ও উঠে কম (low tillering capacity)।

সি-ও—২১৩ (Co. 213)—কৃষি বিভাগের এখনকার সুয়োরাণী! মাঝারী সরু আখ, দেখতে লালচে কটা। সব রকমে ভাল। গুড় বেশ হয় আর সে গুড়ও হয় নিখুত। ফলনও বেশ ভাল। টিকলীর গোড়ায় অনেক গাছ ওঠে, (It has good tillering powers) আর এ হাজা শুকো খুব সইতে পারে।

বি—১৪৭ (B. 147)—খুব সুন্দর আখ চিবিয়ে খাওয়া বা গুড় করা দুয়ের পক্ষেই ভাল। উত্তর বাংলায় খুব ভাল জন্মে। তবে দোষের মধ্যে এতে বড় পোকা আর ব্যারাম লাগে; বেশী দিন চাষের পর খারাপ হয়ে (deteriorates) যায়।

· **বি—২০৮** (B. 208)—খুব নরম, চিবিয়ে খাওয়ার উপযুক্ত আখ। চমৎকার এর আস্বাদ, কিন্তু একটু বাতাসেই ভেঙ্গে পড়ে—এত নরম। মস্ত বড় হয়, বেশ দেখতে তবে এদের চাষ করা আর শেয়াল শুয়োরকে নেমন্তন্ন করা প্রায় একই কথা।

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বিদেশীয় ইক্ষু ভারতবর্ষজাত ইক্ষু হইতে উৎপন্ন হইলেও, দেশান্তরে গিয়া ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই কয়েক জাতীয় ইক্ষু অত্যন্ত স্থূলকায়, কোমলত্বক, দীর্ঘাকার ও প্রচুর মিষ্টরস-পূর্ণ। এজন্য ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়া

মরিসাস্ (Mauritius)—প্রধানতঃ মরিসাস্ দ্বীপেই এই ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে বোরবোঁ জাতীয় বলিয়া থাকেন; কিন্তু অনেকের মতে মালাবার উপকূল প্রদেশ হইতেই প্রথমে মরিসাস দ্বীপে নীত হয়। পরে তথায় অসম্ভব উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই জাতীয় ইক্ষু বংশদণ্ডের ন্যায় স্থূল ও অত্যন্ত মিষ্টরসপূর্ণ। এদেশে ইহার চাষ নিষ্ফল হইয়াছে।

ইয়োলো ভায়োলেট (Yellow violet), **পার্পল ভায়োলেট** (Purple violet), **ষ্ট্রাইপড্ রিবণ** (Striped ribon cane), এবং **শিঙ্গাপুর** (Singapore) নামক কয়েক জাতীয় ডোরাকাটা ইক্ষু জাভা, ফিজি, মালয়, শিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর উৎপন্ন হয়। ইহারা ভারতবর্ষজাত ইক্ষু বটে, কিন্তু বিশেষ রূপান্তরিত হইয়াছে। আজকালকার আমদানি জাভাচিনি (Brown sugar) এই কয়েক জাতীয় ইক্ষু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে এই জাতীয় অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মকায় ইক্ষু সামান্য পরিমাণে জন্মিয়া থাকে; সম্ভবতঃ চেষ্টা করিলে ইহাদের চাষ এদেশে সফল হইতে পারে।

হলদে ট্যানা (Yellow Tan-na):—মোটা, শক্ত আখ যা শিয়ালে বা শুয়োরের তোয়াক্কা রাখেনা। এর ব্যারাম পীড়াও হয় কম। বিঘাতে ৩০ মণ পর্য্যন্ত গুড় হামেসা দেয়। কিন্তু এর গুড় খেতে ভাল না, টক্ টক্ লাগে, আর রেখেও তা খাওয়া চলে না, সহজে গেজে ওঠে। বেশী মোটা বলে আখমাড়া

কলে এদের ভাঙ্গা শক্ত, তুফালি করে ভাঙ্গতে হয়। একটা টিকলী (cutting) লাগালে তার গোড়া দিয়ে গাছ ও উঠে কম (low tillering capacity)।

সি-ও—২১৩ (Co. 213)—কৃষি বিভাগের এখনকার সুয়োরাণী! মাঝারী সরু আখ, দেখতে লালচে কটা। সব রকমে ভাল। গুড় বেশ হয় আর সে গুড়ও হয় নিখুত। ফলনও বেশ ভাল। টিকলীর গোড়ায় অনেক গাছ ওঠে, (It has good tillering powers) আর এ হাজা শুকো খুব সইতে পারে।

বি—১৪৭ (B. 147)—খুব সুন্দর আখ চিবিয়ে খাওয়া বা গুড় করা দুয়ের পক্ষেই ভাল। উত্তর বাংলায় খুব ভাল জন্মে। তবে দোষের মধ্যে এতে বড় পোকা আর ব্যারাম লাগে! বেশী দিন চাষের পর খারাপ হয়ে (deteriorates) যায়।

বি—২০৮ (B. 208)—খুব নরম, চিবিয়ে খাওয়ার উপযুক্ত আখ। চমৎকার এর আস্বাদ, কিন্তু একটু বাতাসেই ভেঙ্গে পড়ে—এত নরম। মস্ত বড় হয়, বেশ দেখতে তবে এদের চাষ করা আর শেয়াল শুয়োরকে নেমন্তন্ন করা প্রায় একই কথা।

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বিদেশীয় ইক্ষু ভারতবর্ষজাত ইক্ষু হইতে উৎপন্ন হইলেও, দেশান্তরে গিয়া ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই কয়েক জাতীয় ইক্ষু অত্যন্ত স্থূলকায়, কোমলত্বক, দীর্ঘাকার ও প্রচুর মিষ্টরস-পূর্ণ। এজন্য ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়া

মরিসাস্ (Mauritius)—প্রধানতঃ মরিসাস্ দ্বীপেই এই ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে বোরবোঁ জাতীয় বলিয়া থাকেন; কিন্তু অনেকের মতে মালাবার উপকূল প্রদেশ হইতেই প্রথমে মরিসাস দ্বীপে নীত হয়। পরে তথায় অসম্ভব উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই জাতীয় ইক্ষু বংশদণ্ডের ন্যায় স্থূল ও অত্যন্ত মিষ্টরসপূর্ণ। এদেশে ইহার চাষ নিষ্ফল হইয়াছে।

ইয়োলো ভায়োলেট (Yellow violet), **পার্পল ভায়োলেট** (Purple violet), **ষ্ট্রাইপড্ রিবণ** (Striped ribon cane), এবং **শিঙ্গাপুর** (Singapore) নামক কয়েক জাতীয় ডোরাকাটা ইক্ষু জাভা, ফিজি, মালয়, শিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর উৎপন্ন হয়। ইহারা ভারতবর্ষজাত ইক্ষু বটে, কিন্তু বিশেষ রূপান্তরিত হইয়াছে। আজকালকার আমদানি জাভাচিনি (Brown sugar) এই কয়েক জাতীয় ইক্ষু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে এই জাতীয় অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মকায় ইক্ষু সামান্য পরিমাণে জন্মিয়া থাকে; সম্ভবতঃ চেষ্টা করিলে ইহাদের চাষ এদেশে সফল হইতে পারে।

হলদে ট্যানা (Yellow Tan-na):—মোটা, শক্ত আখ যা শিয়ালে বা শুয়োরের তোয়াক্কা রাখেনা। এর ব্যারাম পীড়াও হয় কম। বিঘাতে ৩০ মণ পর্য্যন্ত গুড় হামেসা দেয়। কিন্তু এর গুড় খেতে ভাল না, টক্ টক্ লাগে, আর রেখেও তা খাওয়া চলে না, সহজে গেজে ওঠে। বেশী মোটা বলে আখমাড়া

আধুনিক ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ কল বসাইয়া চিনি প্রস্তুত করিতে হইবে।

৯। বিট চিনির উপর যেরূপ শুল্ক (Countervailing duty) বসিয়াছে, মরিসাস, জাভা প্রভৃতি দ্বীপজাত ইক্ষু চিনির উপরও যাহাতে সেইরূপ শুল্ক বসে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

৬। ভূমি নির্ব্বাচন—জাতি বিশেষে ইক্ষু সর্ব্ববিধ ভূমিতেই জন্মিতে পারে এবং ইহার চাষে প্রচুর জলের আবশ্যক হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া ইক্ষুক্ষেত্র জলে প্লাবিত করিয়া রাখিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। এজন্য ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে সিক্ত হইয়া অতিরিক্ত জল যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার সুচারু বন্দোবস্ত করিতে হইবে। জাতিভেদে ইক্ষু সকল প্রকার ভূমির উপযোগী হইলেও, উচ্চ, সরস ও অত্যন্ত শুষ্ক, কঠিন এবং বালুকাশূন্য এঁটেল মাটিতে ইক্ষু সুবিধাজনক ভাবে জন্মে না। অভাব পক্ষে ইহাতে আবশ্যক মত বালুকা, গোময়াদি পশু বিষ্ঠা, উদ্ভিজ্জ সার প্রভৃতি মিশ্রিত ও প্রচুর জল সেচন করিয়া চাষ করিতে হইবে। এরূপ ভূমি সর্ব্বদা সরস থাকা আবশ্যক, যেন কোনমতে শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া না যায়। লবণ চুণ এবং ক্ষার ইক্ষুর নিমিত্ত সামান্য প্রয়োজনীয় হইলেও মৃত্তিকাতে সোডা (Soda) ম্যাগনেসিয়া (Magnesia) প্রভৃতি প্রচুর বিদ্যমান থাকিলে ইক্ষুর চাষ করা বৃথা; উসর মৃত্তিকা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ফসল ত ভালই হয় না, অধিকন্তু উৎপন্ন গুড় ও চিনি লবণ বা ক্ষার স্বাদবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যে

ও বহু রসপূর্ণ আমাদিগকে সেইগুলির চাষ বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

৩। যে জাতীয় ইক্ষুর চাষ করিতে হইবে, তাহা কোমল বা দৃঢ়ত্বক, স্বল্পপ্রাণ (delicate) বা দৃঢ়প্রাণ (hardy), কলে মাড়াইলে সহজেই সমস্ত রস নির্গত হয়, বা বহুক্ষণে অতি কষ্টে অপেক্ষাকৃত অল্প রস নির্গত হয় এটীও—নিরূপণ করা আবশ্যক।

৪। গুড় ও চিনি প্রস্তুতের জন্য উন্নত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যেন প্রস্তুতকালে কোন অংশ নষ্ট না হয়।

৫। যেরূপ মিষ্টরসবহুল ইক্ষুর কাজ বাড়াইতে হইবে, নানাবিধ সহজ উপায়ে যাহাতে গুড়ে মাত অপেক্ষা সারের ভাগ বেশী জন্মে তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে।

৬। কলে যেরূপ চিনি প্রস্তুত হইবে, চিনির পরিত্যক্ত অংশ হইতে সেইরূপ মাতগুড়, চিটা, মেথিলেটেড স্পিরিট্, (Methylated spirit) ভিনিগার (Vinegar), রম (rum), প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া কলের লাভ বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

৭। কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে কোন নির্দ্দিষ্ট জাতীয় ইক্ষু একাদিক্রমে ৫।৭ বৎসর কাল চাষ করিলে ভূমি যেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, ইক্ষুও তদ্রূপ অপকর্ষ ভাব প্রাপ্ত হয়। এ নিমিত্ত ৩।৫ বৎসর অন্তর নূতন ভূমিতে ভূমির উপযোগী নূতন ইক্ষুর চাষ করিতে হইবে বা পুরাতন বীজ পরিত্যাগ করতঃ তাহাই অন্য কোন দূরস্থান হইতে আনাইয়া চাষ করিতে হইবে।

৮। যে অল্প স্থানে প্রচুর ইক্ষুর চাষ হয়, তথায় সর্ব্বাপেক্ষা

আধুনিক ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ কল বসাইয়া চিনি প্রস্তুত করিতে হইবে।

৯। বিট চিনির উপর যেরূপ শুল্ক (Countervailing duty) বসিয়াছে, মরিসাস, জাভা প্রভৃতি দ্বীপজাত ইক্ষু চিনির উপরও যাহাতে সেইরূপ শুল্ক বসে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

৬। ভূমি নির্ব্বাচন—জাতি বিশেষে ইক্ষু সর্ব্ববিধ ভূমিতেই জন্মিতে পারে এবং ইহার চাষে প্রচুর জলের আবশ্যক হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া ইক্ষুক্ষেত্র জলে প্লাবিত করিয়া রাখিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। এজন্য ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে সিক্ত হইয়া অতিরিক্ত জল যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার সুচারু বন্দোবস্ত করিতে হইবে। জাতিভেদে ইক্ষু সকল প্রকার ভূমির উপযোগী হইলেও, উচ্চ, সরস ও অত্যন্ত শুষ্ক, কঠিন এবং বালুকাশূন্য এঁটেল মাটিতে ইক্ষু সুবিধাজনক ভাবে জন্মে না। অভাব পক্ষে ইহাতে আবশ্যক মত বালুকা, গোময়াদি পশু বিষ্ঠা, উদ্ভিজ্জ সার প্রভৃতি মিশ্রিত ও প্রচুর জল সেচন করিয়া চাষ করিতে হইবে। এরূপ ভূমি সর্ব্বদা সরস থাকা আবশ্যক, যেন কোনমতে শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া না যায়। লবণ চুণ এবং ক্ষার ইক্ষুর নিমিত্ত সামান্য প্রয়োজনীয় হইলেও মৃত্তিকাতে সোডা (Soda) ম্যাগনেসিয়া (Magnesia) প্রভৃতি প্রচুর বিদ্যমান থাকিলে ইক্ষুর চাষ করা বৃথা; উসর মৃত্তিকা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ফসল ত ভালই হয় না, অধিকন্তু উৎপন্ন গুড় ও চিনি লবণ বা ক্ষার স্বাদবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যে

ও বহু রসপূর্ণ আমাদিগকে সেইগুলির চাষ বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

৩। যে জাতীয় ইক্ষুর চাষ করিতে হইবে, তাহা কোমল বা দৃঢ়ত্বক, স্বল্পপ্রাণ (delicate) বা দৃঢ়প্রাণ (hardy), কলে চড়াইলে সহজেই সমস্ত রস নির্গত হয়, বা বহুক্ষণে অতি কষ্টে অপেক্ষাকৃত অল্প রস নির্গত হয় এটীও—নিরূপণ করা আবশ্যক।

৪। গুড় ও চিনি প্রস্তুতের জন্য উন্নত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যেন প্রস্তুতকালে কোন অংশ নষ্ট না হয়।

৫। যেরূপ মিষ্টরসবহুল ইক্ষুর কাজ বাড়াইতে হইবে, নানাবিধ সহজ উপায়ে যাহাতে গুড়ে মাত অপেক্ষা সারের ভাগ বেশী জন্মে তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে।

৬। কলে যেরূপ চিনি প্রস্তুত হইবে, চিনির পরিত্যক্ত অংশ হইতে সেইরূপ মাতগুড়, চিটা, মেথিলেটেড স্পিরিট্, (Methylated spirit) ভিনিগার (Vinegar), রম (rum), প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া কলের লাভ বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

৭। কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে কোন নির্দ্দিষ্ট জাতীয় ইক্ষু একাদিক্রমে ৫।৭ বৎসর কাল চাষ করিলে ভূমি যেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, ইক্ষুও তদ্রূপ অপকর্ষ ভাব প্রাপ্ত হয়। এ নিমিত্ত ৪।৫ বৎসর অন্তর নূতন ভূমিতে ভূমির উপযোগী নূতন ইক্ষুর চাষ করিতে হইবে বা পুরাতন বীজ পরিত্যাগ করতঃ তাহাই অন্য কোন দূরস্থান হইতে আনাইয়া চাষ করিতে হইবে।

৮। যে অল্প স্থানে প্রচুর ইক্ষুর চাষ হয়, তথায় সর্ব্বাপেক্ষা

পাতিয়া ভিতরে প্রবেশ হয় এইরূপ ভাবে ছাই ছড়াইয়া উপরে আবার ভিজা খড় ও ছাই চাপা দিতে হইবে ; যতক্ষণ না গহ্বরটী পূর্ণ হয় এইরূপে উপর্য্যুপরি সাজাইয়া সর্ব্বোপরি ঘন খড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে ; এই উপায়ে ১০।২০ দিনের মধ্যে ইক্ষুর নূতন কল ও শিকড় বাহির হইয়া ক্ষেত্রে রোপণোপযোগী হইয়া উঠে।

৩। ইক্ষুদণ্ড ১ হস্ত পরিমাণ খণ্ড খণ্ড করিয়া একেবারেই ভূমিতে রোপিত হইতে পারে ; এইরূপভাবে রোপিত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষেত্রটী একবার সেচদিয়া উত্তমরূপ ভিজাইয়া লইয়া ইক্ষুদণ্ড মৃত্তিকার ভিতর ৩।৪ ইঞ্চি গভীরভাবে বসান কর্ত্তব্য। নতুবা সকল গ্রন্থি হইতে কল বাহির হয় না। ইক্ষুর গ্রন্থি হইতে কল ও শিকড় বাহির হইলেই অবিলম্বে ক্ষেত্রে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

৪। মরিসাস, জামেকা প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুর বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন করিয়াও চাষ হইয়া থাকে ; অনেকের মতে বীজোৎপন্ন চারা রোগশূন্য হয় ; ইক্ষু বীজ অনেকটা যব ও গোধূমের আকৃতিবিশিষ্ট,—কোন জাতীয় বীজ ছোট, কোনটী বা বড়। ভারতবর্ষের বীজোৎপন্ন ইক্ষুর চাষ প্রায় দেখা যায় না। যুক্ত প্রদেশের কোথাও কোথাও বীজ হইতে ইক্ষুর চাষ হইতে দেখা যায়

৮। রোপণ কাল—মাঘমাসের শেষ বরাবর একটু উষ্ণভাব উপস্থিত হইলেই ইক্ষু রোপণের সময় হইয়াছে

৭। **চারা প্রস্তুত করণ**—বীজের নিমিত্ত রোগগ্রস্ত ইক্ষুদণ্ড কোনরূপেই গ্রহণ করা উচিত নহে। যাহা কোন প্রকারে কীট ভক্ষিত বা যাহার পত্র শুষ্ক হইয়া উই কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে বা যে ইক্ষুর অভ্যন্তরস্থ মাংসভাগে লালচে দাগ পড়িয়াছে বা যে সকল জাতি সহজেই কীটাক্রান্ত হয়, বীজের নিমিত্ত তাহারা গুরুভার, বীজের নিমিত্ত তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। নিম্নলিখিত চারিটী নিয়মে ইক্ষুর চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে; আমাদের দেশে কর্ত্তিত অগ্রভাগ রোপণেরই প্রথা দেখা যায়।

১। সরস অথচ ছায়াময় স্থানে আবশ্যকমত দীর্ঘ ও প্রস্থ এবং ১ বা ১৷৷০ হস্ত গভীর গহ্বর কাটিয়া পুরাতন গোবর ও জল মিশাইয়া ঘন কর্দ্দমের মত করতঃ ইক্ষুর অগ্রভাগগুলি তাহাতে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসাইয়া উপরে লতা পাতা বা বিচালি বা চাটাই দিয়া আবৃত করিতে হইবে, এই উপায়ে ১৫।২০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে কল ও নূতন শিকড় বাহির হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করাই নিয়ম।

২। অগ্রভাগ ব্যতীত সমগ্র ইক্ষুদণ্ড হইতেও চারা প্রস্তুত হইতে পারে; যাহাতে কল (Bud) গুলি কোনরূপে নষ্ট না হয় এবং মধ্যে ৩।৪টি কলযুক্ত গ্রন্থি থাকে, এইরূপভাবে ইক্ষুদণ্ডগুলি ১ ফুট আন্দাজ, দীর্ঘে খণ্ড খণ্ড কাটিতে হইবে; পরে দীর্ঘ প্রস্থে তিন হস্ত ও দুই হস্ত গভীর একটী গহ্বর কাটিয়া নিম্নে ভিজা খড় ও ছাই একস্তর বিছাইয়া তদুপরি কর্ত্তিত খণ্ডগুলি ঘনভাবে

পাতিয়া ভিতরে প্রবেশ হয় এইরূপ ভাবে ছাই ছড়াইয়া উপরে আবার ভিজা খড় ও ছাই চাপা দিতে হইবে; যতক্ষণ না গহ্বরটী পূর্ণ হয় এইরূপে উপর্য্যুপরি সাজাইয়া সর্ব্বোপরি ঘন খড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে; এই উপায়ে ১০।২০ দিনের মধ্যে ইক্ষুর নূতন কল ও শিকড় বাহির হইয়া ক্ষেত্রে রোপণোপযোগী হইয়া উঠে।

৩। ইক্ষুদণ্ড ১ হস্ত পরিমাণ খণ্ড খণ্ড করিয়া একেবারেই ভূমিতে রোপিত হইতে পারে; এইরূপভাবে রোপিত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষেত্রটী একবার সেচদিয়া উত্তমরূপ ভিজাইয়া লইয়া ইক্ষুদণ্ড মৃত্তিকার ভিতর ৩।৪ ইঞ্চি গভীরভাবে বসান কর্ত্তব্য। নতুবা সকল গ্রন্থি হইতে কল বাহির হয় না। ইক্ষুর গ্রন্থি হইতে কল ও শিকড় বাহির হইলেই অবিলম্বে ক্ষেত্রে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

৪। মরিসাস, জামেকা প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুর বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন করিয়াও চাষ হইয়া থাকে; অনেকের মতে বীজোৎপন্ন চারা রোগশূন্য হয়; ইক্ষু বীজ অনেকটা যব ও গোধূমের আকৃতিবিশিষ্ট,—কোন জাতীয় বীজ ছোট, কোনটী বা বড়। ভারতবর্ষের বীজোৎপন্ন ইক্ষুর চাষ প্রায় দেখা যায় না। যুক্ত প্রদেশের কোথাও কোথাও বীজ হইতে ইক্ষুর চাষ হইতে দেখা যায়

৮। রোপণ কাল—মাঘমাসের শেষ বরাবর একটু উষ্ণভাব উপস্থিত হইলেই ইক্ষু রোপণের সময় হইয়াছে

৭। **চারা প্রস্তুত করণ**—বীজের নিমিত্ত রোগগ্রস্ত ইক্ষুদণ্ড কোনরূপেই গ্রহণ করা উচিত নহে। যাহা কোন প্রকারে কীট ভক্ষিত বা যাহার পত্র শুষ্ক হইয়া উই কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে বা যে ইক্ষুর অভ্যন্তরস্থ মাংসভাগে লালচে দাগ পড়িয়াছে বা যে সকল জাতি সহজেই কীটাক্রান্ত হয়, বীজের নিমিত্ত তাহারা গুরুভার, বীজের নিমিত্ত তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। নিম্নলিখিত চারিটী নিয়মে ইক্ষুর চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে ; আমাদের দেশে কর্ত্তিত অগ্রভাগ রোপণেরই প্রথা দেখা যায়।

১। সরস অথচ ছায়াময় স্থানে আবশ্যকমত দীর্ঘ ও প্রস্থ এবং ১ বা ১॥০ হস্ত গভীর গহ্বর কাটিয়া পুরাতন গোবর ও জল মিশাইয়া ঘন কর্দ্দমের মত করতঃ ইক্ষুর অগ্রভাগগুলি তাহাতে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসাইয়া উপরে লতা পাতা বা বিচালি বা চাটাই দিয়া আবৃত করিতে হইবে, এই উপায়ে ১৫।২০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে কল ও নূতন শিকড় বাহির হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করাই নিয়ম।

২। অগ্রভাগ ব্যতীত সমগ্র ইক্ষুদণ্ড হইতেও চারা প্রস্তুত হইতে পারে ; যাহাতে কল (Bud) গুলি কোনরূপে নষ্ট না হয় এবং মধ্যে ৩।৪টি কলযুক্ত গ্রন্থি থাকে, এইরূপভাবে ইক্ষুদণ্ডগুলি ১ ফুট আন্দাজ দীর্ঘে খণ্ড খণ্ড কাটিতে হইবে ; পরে দীর্ঘ প্রস্থে তিন হস্ত ও দুই হস্ত গভীর একটী গহ্বর কাটিয়া নিম্নে ভিজা খড় ও ছাই একস্তর বিছাইয়া তদুপরি কর্ত্তিত খণ্ডগুলি ঘনভাবে

এবং অন্য প্রকারের মোটা জাতের ইক্ষু জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি কাটা আবশ্যক। একারণ ডিসেম্বর হইতে জানুয়ারী মাসের মধ্যে ইক্ষু রোপণ অসঙ্গত নয়। রোপণের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাণ্ডা থাকিলে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত রোপণ করা চলিতে পারে। সামান্য শীত থাকিতে রোপণ করিলে চারাগুলি দাঁড়াইয়া যাইতে পারে।

মে মাস হইতে অক্টোবরের কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ইক্ষুর সতেজ বৃদ্ধির সময়, এই সময় বায়ু আর্দ্র থাকে। শীতকাল আরম্ভ হইলে ইক্ষু ফসলের আর বৃদ্ধি হয় না। দেখা যায় যে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে রোওয়া ইক্ষু শতকরা ৪০ ভাগ Shoot Borer কীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় অথচ শীতের পূর্ব্বে রোওয়া ইক্ষুর মোট শতকরা ১০ ভাগ ঈদৃশ আক্রান্ত হয়।

পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে অক্টোবর মাসে রোওয়া ইক্ষু ১৩ মাস পরে কাটা হইলে প্রতি একরে ৯৪৭০ মণ গুড় পাওয়া যায় এবং ১৫ মাস পরে কাটা হইলে ৯৯০০ মণ পাওয়া যায়। এদিকে নভেম্বর মাসে রোওয়া ইক্ষুর ১৩ মাস পরে গুড়ের হার ১০৪০০ মণ ও ১৪ মাস পরে ১১৩৪৩ মণ। এইরূপে সচরাচর ইক্ষু ফসল যতকাল জমিতে রাখা যায়, তাহাপেক্ষা অধিক কাল রাখিলে গুড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং আবাদ প্রভৃতি করিবার জন্যও যথেস্ট সময় পাওয়া যায়। কোন কোন অভিজ্ঞ বলেন যে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে রোওয়া ইক্ষু বেশ পুষ্টিলাভ করে; সমস্ত শীতকাল বর্দ্ধিত হইয়া মার্চ্চ মাসে চতুষ্পার্শ্বের জমি ছায়াযুক্ত

করিবার উপযোগী হয়। এইরূপ ছায়া হইলে জুন মাস অর্থাৎ বর্ষাপাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রখর সূর্য্য তাপ সহ্য করিতে সক্ষম হয়। আমাদের মনে হয় যে সকল কৃষকেরা অল্প পরিমাণ জমি চাষ করে তাহাদের পক্ষে ফেব্রুয়ারী মাসে রোপণই প্রশস্ত।

বিভিন্ন প্রকারের ইক্ষু এবং বিভিন্ন প্রকারের জল হাওয়ার হিসাবে ইক্ষু রোপণের প্রথাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। পাতলা আখ সাধারণতঃ খুব কাছাকাছি রোওয়া হয় কিন্তু মোটা জাতের আখ দূরে দূরে রোপণ করিতে দেখা যায়।

বাঙ্গালা দেশে, বিশেষতঃ রাজসাহী জেলায় খাগড়া ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তথায় ৬ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর পগার কাটিয়া তন্মধ্যে ১২″ হইতে ১৮″ ইঞ্চি অন্তর ইক্ষুর চারা রোপণ করা হয়। কিন্তু রাজসাহী জেলার চলিত এই প্রথানুসারে রোপণ অতিরিক্ত বীজ আবশ্যক হয় এবং মাটী দেওয়া ও আগাছা পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত অধিক ব্যয় হয়। কৃষকেরা সাধারণতঃ শেষোক্ত দুইটি আবশ্যকীয় কার্য্যে অবহেলা করে। পাতলা ইক্ষু কিরূপ দূর দূর বসান উচিত এ বিষয়ে বাঙ্গলা দেশে কোন ধারাবাহিক পরীক্ষা হয় নাই।

যুক্ত-প্রদেশে কানপুর ক্ষেত্রে এ বিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য ইক্ষু চাষ ১৮ এবং ২৭ ইঞ্চি অন্তর রোওয়া হয় এবং ১৮ ইঞ্চি অন্তর রোওয়া ইক্ষু হইতে অধিক পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল।

মোটা মোটা ইক্ষু সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লেখকেরা ভিন্ন ভিন্ন রোপণ প্রণালীর ব্যবস্থা করেন; পরীখা খনন করিয়া রোপণ

অনেকেই পছন্দ করেন এবং এ প্রথার সাপেক্ষ বলিবার অনেক আছে। সাজাহানপুরে পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে অগভীর পরীখা খনন পূর্ব্বক চারা রোপণই কোন কোন বিশেষতঃ, ঈষৎ পীতাভ জাতীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা; কেন না এরূপ উপায়ে ইক্ষুর অঙ্কুরোদ্গম বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি একরে ফসলও বেশী জন্মায়। পরীখাগুলি দুই ফুট চওড়া হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক পরীখার মধ্যস্থল হইতে অপর পরীখার মধ্যস্থলের মধ্যে ৪ ফুট ব্যবধান দরকার। বর্ষকালে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়। পরীখা কাটা অক্টোবর হইতে নভেম্বর মাসের মধ্যেই শেষ হওয়া উচিত; নভেম্বর মাস শেষ হইয়া গেলে কদাচ পরীখা খনন পূর্ব্বক রোপণের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। রোওয়ার দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে খনন করিলে কার্য্যের কোন সুবিধা হইবে না। অধিকন্তু সব পণ্ড হইবে। পরীখা প্রথমে ৬ ইঞ্চি গভীর করিয়া কাটিয়া ২ফুট বিস্তৃত পরীখার উভয় পার্শ্বে মাটীর আইল দিতে হয়। ৬ ইঞ্চি গর্ত্ত করিবার পর পুনরায় ৯ ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত কাটিয়া গোবর, সহরের আবর্জ্জনা ও খোল প্রভৃতির সার দেওয়া আবশ্যক এবং মধ্যে মধ্যে পরীখা খুঁড়িয়া দিলে ভাল হয়। ভাল ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে প্রতি একরে প্রায় ৩৫ মণ খোল অথবা ১২০ হইতে ১৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন সার দেওয়ার আবশ্যক। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ হইতে মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইক্ষু রোওয়া হয়। ইক্ষু চারার সতেজ বৃদ্ধির জন্য জমিতে উপযুক্ত উত্তাপ সঞ্চয়ের পূর্ব্বে রোওয়া উচিত নয়। শীতকালের

বৃষ্টি হইতে উপযুক্ত জলীয় বাষ্প না পাইলে পরীখাতে জল সেচন করার আবশ্যক হইতে পারে। প্রতি একরে ৬০০০ হইতে ৮০০০ চারা রোপণের নিমিত্ত আবশ্যক। চারাগাছ ২ ইঞ্চি হইতে ৬ ফুট হইলে পরীখাগুলি ক্রমে ক্রমে মাটীর দ্বারা পূর্ণ করা হয়। মে মাসের মাঝামাঝি হইতে শেষ পর্য্যন্ত মাটী দেওয়া শেষ হওয়া উচিত। ইক্ষু চারা ৪ ফুট অন্তর লাঙ্গল দ্বারা পগার কাটীয়া রোপণ করা দরকার। খোল ও হাড় চূর্ণের সার ১ গায়ে দেওয়া হয় এবং একজন মজুর কোদালী দ্বারা সার মিশ্রিত করিয়া দেয়, এবং পগার প্রস্থে একটু বড় করিয়া দেয়; তৎপরে একদল লোক চারাগুলি ৯ ইঞ্চি অন্তর রোপণ করিয়া যায়। কুইন্সল্যাণ্ড দেশের রোপণ প্রণালী এদেশে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চারাগুলি ৬ ফুট অন্তর দু সারি অগভীর খানা খুঁড়িয়া রোওয়া হয়; দুটী সারি কাছাকাছি হওয়ায় কেবলমাত্র ১৮ ইঞ্চি ব্যবধান থাকে এবং কার্য্যতঃ ৩ ফুট অন্তর রোপণ করা হয়। ইহাতে গাদা করিবারও ব্যয় সংক্ষেপ হয় এবং মধ্যে অন্যান্য ফসল ও চাষের জায়গা থাকে। আমরা এই ৩ ফুট গভীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে হলুদ রোপণ করাইয়া থাকি। উহা ছায়া ভালবাসে এবং ইক্ষু চাষের ব্যয়ের কিয়দংশ ইহা হইতে পাওয়া যায়। এখনও এ বিষয়ে পরীক্ষা শেষ হয় নাই।

যুক্তপ্রদেশে তিন ফুট অন্তর রোপণ করিয়া খুব ভাল ফসল পাওয়া গিয়াছে।

১০। মূল রোপণ—বিশেষজ্ঞরা বলেন ইক্ষুর মূল ইক্ষু উৎপাদনের জন্য বেশ ব্যবহৃত হইতে পারে। ডাক্তার বারবার এ মতের সমর্থন করিয়াও তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে মূলগুলি তুলিয়া কাটিয়া রোপণ করাই যুক্তিযুক্ত। সাধারণতঃ এই সকল মূলগুলি খুঁড়িয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয় অথবা ভূমিতে থাকিয়া পচিয়া যায়।

এই উপায় অবলম্বন করিলে প্রতি একরে চারার বাবত খরচ শতকরা ৫ টাকা কম হইবে। এক একর জমীর জন্য ৫০০০ মূলের দরকার এবং এক একরের মূল হইতেই পাঁচ একর জমী রোওয়া যাইতে পারে। ইহাতে আরও বিশেষ সুবিধা এই যে সমস্ত জমীতেই সমান ফসল জন্মায় এবং কোন জায়গা খালি পড়িয়া থাকিতে পায় না। কিন্তু রোগাক্রান্ত ক্ষেত্র হইতে মূল লওয়া মোটেই উচিত নয়।

• ইক্ষু চাষে বীজ রোপণ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ এবং প্রত্যেক
ইক্ষু চাষে বীজ রোপণ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ এবং প্রত্যেক
একর জমীতে কতগুলি চারা রোওয়ার আবশ্যক এ বিষয়ে রীতিমত পরীক্ষা আবশ্যক।

বিভিন্ন প্রকারের ইক্ষু হিসাবে চারার সংখ্যা প্রতি একরে বেশী কম হয় এবং রোপণের ধাঁজা হিসাবে চারার সংখ্যার তারতম্য হয়। সরকারী ক্ষেত্রে প্রতি একরে ৪ ইঞ্চি পরিমাণ ৯০০০ টুকরা আবশ্যক হয়। বাঙ্গালা দেশের জমীতে কত চারা আবশ্যক এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন রীতি মত পরীক্ষা হয় নাই।

৬০০০ টুকরা চারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বড় উৎপন্ন হইয়াছে। চাষারা সাধারণতঃ ১২০০ হইতে ১৫০০ চারা কিন্তু দেয়।

১১। ছাপর বা বীজতলা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রণালী —প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে ইক্ষু পাকিয়া গেলে, কৃষকেরা বাগানের নিকট একটী ছায়াযুক্ত স্থানে বীজ-তলায় আকের ডগা গুলি সযত্নে রাখিয়া দেয়। যথেষ্ট পরিমাণে সার,মাটী ও ছাই দিয়া বীজতলা আবাদ করিয়া ছোট ছোট ভাটিতে পরিণত করা হয়। পরে উপযুক্ত জল দিয়া ভাটিতে কাদা করিয়া আকের ডগাগুলি আধ ইঞ্চ অন্তর পাশাপাশি করিয়া কাদার ভিতর বসাইয়া দেওয়া হয়। বসাইয়া দেওয়ার সময় ডগারচোক্‌গুলি দুই পাশে থাকে ও ডগার উপরিভাগ সামান্য পরিমাণে দেখা যায়। ভাটিগুলি ছাই বা খড় দ্বারা এরূপভাবে আবৃত করিয়া রাখা হয় যাহাতে সূর্য্যের কিরণ না আসিতে পারে; এবং উপযুক্তরূপে জল ছিটাইয়া জমি আদ্র রাখা হয়। এপ্রিল মাসে প্রথম বৃষ্টি হইলেই পূর্ব্ব হইতেই প্রচুর পরিমাণে সার দিয়া উত্তমরূপে কর্ষিত জমিতে চারাগুলি তুলিয়া রোপণ করা হয়। এক একর জমিতে ১০,০০০ দশ হাজার বীজ রোপিত হইয়া থাকে। যদি রোপণের পর বৃষ্টি না হয় তবে কূপ অথবা পুষ্করিণীর জল কলসে করিয়া জমিতে দিয়া চারাগুলি বাঁচাইয়া রাখিতে হয়; অন্যথা পূর্ব্ববঙ্গে জল সেচনের ব্যবস্থা নাই। বীজে উঁই ধরিবার ভয় থাকিলে সময়ে সময়ে উপরোক্ত উপায়ে মাটিতে ডগাগুলিকে না রাখিয়া

মাটী হইতে একটু উঁচুতে মাচা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর ভাটি দিতে হয়।

পশ্চিম বঙ্গের প্রণালী।

বর্দ্ধমান বিভাগে সাধারণতঃ পুকুর বা কাঁদরের ধারে ৬ ইঞ্চি হইতে ৯ ইঞ্চি গভীর করিয়া একটী চারকোণা গর্ত্ত খনন করা হয়। ঐ গর্ত্তে আকের ডগাগুলি গর্ত্তের মধ্যে কাৎ করিয়া রাখা হয় এবং এক সার ডগা রাখার পর তাহার উপর আধ ইঞ্চি পরিমাণ উত্তমরূপে গুড়া মাটী দিয়া আর এক·সার "ডগা" রাখা হয়। এই প্রকারে ডগাগুলি রাখিয়া যতদিন পর্য্যন্ত ঐ গুলি জমিতে না লাগান হয় ততদিন ঐ ভাটিতে নিয়মিত ভাবে জল দিতে হয়। প্রকাশ থাকে যে, বর্দ্ধমান বিভাগে আকের আবাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সার ব্যবহার ও উপযুক্ত পরিমাণে জল সেচন করা হয়, যাহা বাংলার আর কোথাও দেখা যায় না। উক্ত প্রকারে জমিতে উই ধরিলে রসুন সিদ্ধ জল ছিটাইয়া দেওয়া হয়।

উত্তর বঙ্গের প্রণালী।

উত্তর বঙ্গে ও মধ্য বঙ্গের কতকাংশ আউস ধান ও পাট কাটিয়া জমি উত্তমরূপে চাষ দিয়া ও গোবর সার দিয়া প্রস্তুত করিয়া আকের ডগাগুলি একেবারে ক্ষেতে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। ঐ রকম আবাদে প্রায় পনর হাজার বীজের আবশ্যক হয়। জল সেচনের কোনই ব্যবস্থা নাই।

ইক্ষুর আবাদ

আউস ধান ও পাট কাটিবার পর দেশী লাঙ্গল দিয়া আকের জমি সাধারণতঃ ৮।৯ বার চাষ ও মই দিয়া উত্তমরূপে আবাদ করিয়া একর প্রতি দেড়শত মণ আন্দাজ গোবর সার চাষ মইয়ের সঙ্গে জমিতে উত্তমরূপে মিশাইয়া দেওয়া আবশ্যক এবং জমি হইতে সকল প্রকার আগাছা ও মুথা বাছিয়া ফেলা উচিত। উন্নত প্রকারের যন্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ পঞ্জাব লাঙ্গলের দ্বারা লম্বালম্বি ও আড়া আড়িভাবে দুইবার চাষ দিয়া এবং দুইবার স্প্রিং টুথ হ্যারো ও দুইবার জিগ জ্যাগ হ্যারো চালাইলেই সুন্দররূপে জমি আবাদ হইয়া যায়। লাল মাটিতে গোবর সার দিবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে একর প্রতি দশ মণ চূন ছিটাইয়া দেওয়া আবশ্যক উক্তরূপে সার ও চাষ মই দিয়া জমি আবাদ করার পর জমিতে চারি ফুট অন্তর সমান্তরাল ভাবে আন্দাজ একফুট চওড়া ও নয় ইঞ্চি গভীর ড্রেন কাটিয়া আকের ডগা লাগাইবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যদ্যপি রিডিং প্লাউ থাকে তবে তাহার দ্বারা অতি সহজেই ঐ প্রকার ড্রেন বা "ভাঁওর" করা যায়। ড্রেন কাটা হইলে ড্রেনের তলদেশ ভর কোদালি অর্থাৎ নয় ইঞ্চি পরিমিত গভীর ভাবে কোপাইয়া মিহি করিয়া একর প্রতি একশত মণ গোবর সার, পাঁচ মণ খইল ও দেড় মণ হাড়ের গুড়া উক্ত ড্রেন গুলির তলায় ছিটাইয়া কোদালি দ্বারা ভাল করিয়া "খুঁসিয়া" জমিতে মিশাইয়া দিতে হয়। উক্ত প্রকারের আবাদ কার্য্য অক্টোবর মাসের শেষ

ভাগেই সমাধা করিতে হইবে এবং আকের ডগাগুলি ড্রেনের মধ্যে দুই তিন ইঞ্চি মাটীর ভিতর বসাইয়া দিতে হইবে; যদ্যপি জমিতে রস না থাকে তবে ড্রেনের মধ্যে জল সেচন করিয়া মাটি খুঁসিয়া "ডগা" বসাইলেই ভাল হয়, নচেৎ চারা সম্পূর্ণভাবে বাহির না হইলে পরে জল সেচ দিতে হয়। যদি কোন স্থানে বেশী ফাঁক পড়ে তবে নূতন চারা বা ডগা বসাইয়া দিতে হইবে। এই প্রকার রোপণকার্য্য কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ করিতে পারিলেই ভাল হয়। যখন চারা গুলি বাহির হইয়া যায় এবং পাঁচ ছয় ইঞ্চি লম্বা হয় তখন ড্রেনের দুই পাশের মাটী অল্প অল্প করিয়া নাড়াইয়া কতকাংশে ড্রেনগুলি ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকারে আকের আবাদ করিলে বসন্তের বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে চারাগুলি শীঘ্র বাড়িয়া উঠিবে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ড্রেনের দুই পাশে মাটী দিয়া ড্রেনগুলি ভরিয়া দিতে হইবে। বর্ষার বৃষ্টি পাতের সঙ্গে চারা বড় হইলে আর একবার একর প্রতি পাঁচ মণ খইল ও দেড় মণ হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া চারাগুলির গোড়ায় ছিটাইয়া সামান্য ভাবে দুই পাশ হইতে কোদালি দ্বারা মাটী চাপা দিতে হইবে। কিছুদিন বাদে অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে কিংবা শ্রাবণমাসের প্রথমেই দুইচারি দিন বৃষ্টি বন্ধ হইলেই এবং জমি কতকটা "যোধরা" হইলেই আর একবার ভাল করিয়া মাটি দিতে হইবে এবং তাহা হইলে বর্ষার আবাদ শেষ হইবে। এই শেষ মাটি দিবার পর প্রথমে যেখানে ড্রেন ছিল সেখানে "ভিলি" হইবে এবং যেখানে "ভিলি" ছিল সেখানে জল নিকাশের

ড্রেন হইবে, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে যেন কোন স্থানে জল জমিয়া চারার অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে। শেষে মাটি দিবার পর "যো" বুঝিয়া আকের ঝোলা পাতা জড়াইয়া দেওয়া ও স্থান বিশেষে ফেলাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বন্য জন্তুর উৎপাত থাকিলে আকের পাতা ভাল করিয়া জড়াইয়া দেওয়া উচিৎ ভাল আবাদ করিলে আক বেশ লম্বা হয়। "কেতনের" সময় আক পড়িয়া যাওয়ার বিশেষ ভয়, সেই কারণে চার পাঁচ ঝাড় আকের মাথা একত্রে পাতা দিয়া জড়াইয়া বাঁধিলে হেলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা কার্ত্তিক মাসে আক লাগাইতে সক্ষম না হইবেন তাঁহারা যেন মাঘ ফাল্গুনে আক লাগান শেষ করেন, নচেৎ চৈত্র বৈশাখে আক লাগাইলে আকের ফলন কখনও ভাল হইবে না।

কার্ত্তিক মাসে আখ লাগাইতে হইলে ক্ষেত্রের কয়েক লাইন আক কুচাইয়া বীজ তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। এই সময় আকের সকল অংশই বীজে পরিণত করিতে পারা যায়।

১২। রোপণ ও চাষ—সমস্ত ক্ষেত্রে লম্বালম্বি ভাবে দুই হস্ত অন্তর কোদাল দ্বারা মুটম হাত চওড়া ও ৯ ইঞ্চি গভীর নালা কাটিয়া মৃত্তিকা দুই পার্শ্বে উঠাইয়া ফেলিতে হইবে এবং পূর্ব্ব হইতে রক্ষিত অবশিষ্ট সারের তিন ভাগের দুই ভাগ পরিমাণ নালার মধ্যস্থ মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিলিত করতঃ শিকড় শুদ্ধ কল বাহিয়ান এক এক খণ্ড ইক্ষু ১৫ ইঞ্চ অন্তর

বসাইয়া যে মৃত্তিকা উভয় পার্শ্বে উঠাইয়া ফেলা হইয়াছে, তাহাই ৩।৪ ইঞ্চ পুরু করিয়া চাপা দিয়া ঈষৎ দাবিয়া অবশিষ্ট মৃত্তিকা উভয় নালার মধ্যস্থ ভূমি ভাগে ছড়াইয়া দিতে হইবে। রোপণ কালে ভূমি শুষ্ক থাকিলে আবশ্যকমত জল সেচনে সরস করা কর্ত্তব্য নতুবা উই লাগিয়া চারা নষ্ট করিতে পারে।

১৩। সার প্রয়োগ—ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে সার ভাগ গ্রহণ করিয়া ভূমিকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এজন্য সার প্রয়োগ আবশ্যক ; কিন্তু সার অধিক দিলেই যে গুড় বা চিনি অধিক জন্মিবে এরূপ কোন কথা নাই। তবে সার প্রয়োগে গাছ সতেজ হয় ও মাতিয়া উঠে, ইক্ষু দণ্ডের সংখ্যাও বৰ্দ্ধিত হয়; এজন্য গুড়ের পরিমাণ অধিক হয়। যাহা হউক, ইক্ষু ক্ষেত্রে পরিমিত সার প্রয়োগ করাই নিয়ম, অতিরিক্ত সার প্রয়োগ বৃথা অর্থব্যয় মাত্র। এ দেশের কোন কোন জেলাতে বিনা সারেও ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। যদি বিনা সারে বিঘা প্রতি ১৫ মণ গুড় পাওয়া যায়—তবে পঞ্চাশ টাকা সারের জন্য ব্যয় করিয়া ২৫ মণ গুড় পাইবার জন্য সার খরচ না করাই উচিত। বিঘা প্রতি ক্ষার (ছাই) ৫।৭ মণ ও গো মহিষাদির বিষ্ঠা ৭০।৮০ মণ বা অশ্ব-বিষ্ঠা ৪০ মণ বা রেড়ী ও সর্ষপ খৈল ২০।৩০ মণ বা অস্থি চূর্ণ ১০ মণ বা সোরা ৫।৬ মণ বা নীলের সিটী ৪০ মণ বা পচা মৎস্য ১০ মণ বা তূলাবীজ চূর্ণ ৩০ মণ প্রয়োগ করিলে সুন্দর ইক্ষু জন্মে। ইক্ষুতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণ সৌবর্চ্চলজনের (Nitrogen)

প্রয়োজন হয়, বায়ু ও ক্ষারেরও সেইরূপ আবশ্যক হইয়া থাকে; বিঘা প্রতি আধমণ সৌবর্চ্চলজন দিবারই নিয়ম, কিন্তু ইহার অধিকাংশ বিগলিত অবস্থায় বর্ষার জলের সহিত বাহির হইয়া বা ভূমির নিম্নে চলিয়া যাওয়ায় মূলকর্ত্তৃক আকর্ষিত না হইবার জন্য গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করে না। এজন্য দ্বিগুণ, ত্রিগুণ পরিমাণে ইহার প্রয়োগ আবশ্যক। মৃত্তিকা জমিয়া কঠিন হইলে মূলে বায়ু-সঞ্চার রোধ বশতঃও গাছের বৃদ্ধি হয় না। ইক্ষুর চাষে গো, মহিষাদির বিষ্ঠা বিশেষ সুলভ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার। কারণ ইহাতে প্রচুর পরিমাণ ইক্ষুর প্রাণধারণ ও বর্দ্ধনোপযোগী সৌবর্চ্চলজন বিদ্যমান আছে। ইহাদের প্রয়োগে ভূমি শিথিল ও বায়ু প্রবেশ-শীল হইয়া উঠে। সুতরাং ভূমির অবিগলিত কঠিন পদার্থ সকল দ্রবীভূত ও বৃক্ষ মূল দ্বারা আকর্ষিত হইয়া তাহার বর্দ্ধনের সহায়তা করে। গোময়াদি পশুবিষ্ঠা ও বৃক্ষপত্রাদি অর্দ্ধবিগলিত (আধপচা) অবস্থায় প্রয়োগ করিলে সারভাগ পচিয়া গাছের উপযোগী হইতে বিলম্ব লাগে; সুতরাং সারগত সৌবর্চ্চলজন (Nitrogen) ভূমির নিম্নে অপর কোন দিক দিয়া বহিয়া যাইতে সক্ষম হয় না, ধীরে ধীরে গাছ সমস্ত অংশই গ্রহণ করে। আপাং, তিলডাঁটা, কলা-বসনা, কুমড়াডাঁটা, নারিকেল বা অপর কোন লতা পত্র ভস্মাদি বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ক্ষার প্রয়োগেও ভূমি শিথিল ও বায়ু প্রবেশশীল হইয়া উঠে, অধিকন্তু ভূমি ও সারের অদ্রবনীয় পদার্থ সকল বিগলিত হইয়া গাছের সদ্য ব্যবহারোপযোগী হয় এবং কীটাদির উপদ্রবের অল্পতা ঘটে। উদ্ভিজ সারের

মধ্যে নীলের সিটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সকল স্থানে ইহা পাওয়া যায় না। কিন্তু যথায় পাইবার সুবিধা আছে, তথায় ইহা শুদ্ধ বা গোময়াদির সহিত বা আধাআধিভাগ প্রয়োগ করিলে সুন্দর ফসল জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগের ন্যায় ইক্ষুর উপযোগী ব্যয়স্বল্প উৎকৃষ্ট সার দেখা যায় না। গো-মহিষাদির বিষ্ঠা ৬ হইতে ৯ মাসের মধ্যে পচিয়া সার হয়; কিন্তু অশ্ববিষ্ঠা দেড় বৎসরের পুরাতন না হইলে প্রয়োগ করা উচিত নহে; ইহা অপেক্ষা অল্প-দিনের হইলে সারের তেজে গাছ ঝান খাইয়া যাইতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্র এবং উত্তর পশ্চিমেও কোথাও কোথাও বিঘা প্রতি ২০০ শত মণ হিসাবে নরবিষ্ঠা ইক্ষুর সাররূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অমেধ্য প্রয়োগ না করাই উচিত কারণ গবাদি পশুবিষ্ঠা ইহা অপেক্ষা শত গুণে উপকারী ও স্বাদ-বর্দ্ধক। খৈল, সোরা, অস্থিচূর্ণ পচা মৎস্য প্রভৃতি ইক্ষুর উপযুক্ত সার হইলেও ব্যয়াধিক্য আছে। এগুলি উপরিউক্ত সারগুলির সহিত আধাআধি পরিমাণে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে ব্যয় অল্প পড়ে। রেড়ী সরিষার খৈল ইক্ষু মাত্রেরই পক্ষে উপকারক। রেড়ীর খৈলে শামসাড়া ইক্ষুর সুন্দর ফলন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ খৈল প্রয়োগে গাছের শিকড়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় গাছ অত্যন্ত বলবান হয় ও ঝাড় বাঁধে এবং ঝড়ে বা বাতাসে সহজে পড়িয়া যায় না। সূক্ষ্ম চূর্ণিত সোরা বর্ষার শেষ বরাবর গাছের গোড়ায় দিতে পারিলে ভাল হয়। ভূমি শুষ্ক থাকিলে সোরা দেওয়ার পর জল সেচন করিতে হইবে; নচেৎ সোরা শীঘ্র উদ্ভিদের

আহারোপযোগী হয় না। অস্থি স্থূল ও সূক্ষ্ম চূর্ণ ভেদে দুই প্রকারে ব্যবহৃত হইতে পারে ; মরিসাস প্রভৃতি স্থানে অস্থিচূর্ণেই ইক্ষুর প্রধান সাররূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম অস্থিচূর্ণ (bone dust) গাছের গোড়ায় বরাবর দিতে পারিলে শীঘ্রই বৃক্ষোপযোগী আহারে পরিণত হয় ; কিন্তু স্থূল অস্থি চূর্ণ (Bone meal) বিলম্বে কার্য্য সাধক ; এজন্য চাষের সময় হইতে জমিতে ছিটাইয়া চাষ করিতে হইবে। ইক্ষুর মূল জমির অধিক নিম্নে যায় না ; এজন্য মূলের নিকটবর্ত্তী স্থানে সার প্রয়োগ করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে সর্ব্বতোভাবেই সারের সার্থকতা হইতে পারে। খৈল সোরা, অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি সার মূল্যবান। যদি গবাদি পশুবিষ্ঠা ও উদ্ভিজ্জ সার অর্দ্ধ পরিমাণে দিয়া জমি প্রস্তুত করতঃ গাছ রোপণের পর পাইট করিবার সময় অর্দ্ধ পরিমাণ খৈল, অস্থি চূর্ণ প্রভৃতি বারে বারে অল্প পরিমাণে গাছের গোড়ায় দেওয়া যায়, তাহা হইলে সারে অল্প খরচ পড়ে অথচ ইক্ষু সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া পুরা ফসল প্রদান করে। সারের মধ্যে সোরা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সুতরাং ইহার প্রচলন নাই বলিলেই চলে। ২।৩ মণ সোরা ও ৮।১০ মণ রেড়ীর খৈল একত্র মিশাইয়া আশ্বিন মাস বরাবর গাছের গোড়ায় দিতে পারিলে ফলন ভাল হইয়া থাকে। সোরা একক অপেক্ষা অন্য সারের সহিত মিশ্রিত ভাবে প্রয়োগ করিলে অধিক ফল দর্শে। অস্থিচূর্ণ প্রয়োগে জমির ক্ষয়িত ফস্ফরাস, চূর্ণ, ক্ষার প্রভৃতি পদার্থের পূরণ হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান পরীক্ষাক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৭০ মণ গোবর ও ৩০ মণ খইল এই উভয় সার

প্রয়োগ করিয়া ৩০/০ মণেরও অধিক গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল সারের মধ্যে খৈল ও গোময়াদি পশুবিষ্ঠা বা খৈল, গোময় ও অস্থিচূর্ণ বা তূলাবীজ, সোরা ও অস্থিচূর্ণ একত্রে প্রয়োগে ইক্ষু সুন্দর জন্মিয়া থাকে ইক্ষুক্ষেত্রে যত পরিমাণ সার দিতে হইবে, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ হলকর্ষণকালে এবং অবশিষ্টভাগ, বপনকাল হইতে বর্ষার পূর্ব্বে যত দিন না গাছ বিশেষ তেজ করে, ততদিন ৩।৪ বারে সামান্য পরিমাণে প্রতিবার নিড়াইবার সময় গাছের গোড়ায় মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে পারিলে ফসল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। ইহার পর বর্ষায় গাছ জোর করিতে থাকিলে আর সার দিবার আবশ্যক হয় না। বিশেষতঃ এ সময়ে শিকড় নাড়াচাড়া করিলে গাছের হানি হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে বরাবর গাছের গোড়ার মাটি আল্‌গা করিয়া দিয়া বিঘাপ্রতি ৫।৭ মণ রেড়ী বা সরিষার খৈল দিয়া থাকেন। ইহাতে রসের গাঢ়ত্ব হয় ও দানাদার চিনি জন্মিয়া থাকে। পচা গোমূত্র সঞ্চিত থাকিলে জল মিশাইয়া এ সময়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিলে গাছের ফলন বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। কারণ গো-মূত্রে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন বিদ্যমান আছে। গোময়াদি পশু বিষ্ঠা এবং ধঞ্চে ভূরা প্রভৃতি কাঁচা উদ্ভিজ্জসার একত্রে ক্ষেত্রে দিলে ইক্ষুর আবশ্যকীয় সৌবর্চ্চলজনতা প্রযুক্ত হয়ই, তদ্ব্যতীত জমি এরূপ শিথিলভাবাপন্ন ও বায়ু প্রবেশশীল হয় যে অন্য সার দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু

জমি শুষ্ক ও উচ্চ দোয়ঁাশ হইলে জল ধারণশক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ধঞ্চে জমিকে সর্ব্বাপেক্ষা সারবতী করিয়া তুলে; কারণ শিম্বিজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ধঞ্চেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন সার সঞ্চয়কারী। ইক্ষুর চাষে নাইট্রোজেন সার অত্যাবশ্যক। এজন্য ক্ষেত্রে ধঞ্চে জন্মাইয়া পশ্চাৎ ইক্ষুর চাষ করিলে অনেক সময়ে বিনা সারেই ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। শণ ও অড়হর ও জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু ধঞ্চের মত নহে।

সার Super phosphate of lime ৩॥০ মণ বিঘাপ্রতি।
Sulphate of Amonia ॥০ অর্দ্ধমণ
Sulphate of Potash ॥০ অর্দ্ধমণ

কোন কোন বিশেষজ্ঞ বিঘাপ্রতি ১২/০ মন নাইট্রোজেন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাংলার গরীব কৃষকেরা উপরোক্ত কোন সারই দিতে পারিবে না একারণ আমার মতে বিঘাপ্রতি ১০/ মণ রেড়ীর খৈল এবং ৫/ মণ যবের গুঁড়া এবং ৩০০/ মণ গোবরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। ইহাতে আমরা পরীক্ষা করিয়া বিঘা প্রতি ১০/ মণ গুড় পাইয়াছি। অবশ্য টানা আকে আমার পরীক্ষা করা হইয়াছে।

১৪। কীট ও রোগ নিবারক ঔষধ—

ইক্ষু অত্যন্ত রোগপ্রবণ। তদ্ব্যতীত ক্ষেত্রে উই ও নানাবিধ কীটাদির উপদ্রব আছে। শৃগালাদির ত কথাই নাই। নির্দ্দোষ ইক্ষুবীজ রোপন করিলেও সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, ক্ষেত্রটী

কীট বা উই বা পিপীলিকাক্রান্ত ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নীরস জমিতে বিশেষতঃ গাছের কল বাহির হইবার সময় উইয়ের উপদ্রব বেশী হয়। গাছ সতেজ ও সবল অবস্থায় থাকিলে সহসা রোগাক্রান্ত হয় না! চৈত্র, বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রটী গভীররূপে ৫।৬ বার লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করতঃ মৃত্তিকা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারিলে উই বা পিপীলিকা সমূহ মরিয়া যায় বা অন্যত্র পলায়ন করে। বপনের প্রাক্কালে নিম্নলিখিত ঔষধগুলিতে ইক্ষুদণ্ড ডুবাইয়া রোপন করিলে কীট ও রোগ অনেক সময় নিবারিত হইয়া থাকে।

১। লবণ ৪ সের, হেনরো (স্বল্প মুল্য হিং) আধপোয়া এবং সূক্ষ্ম চূর্ণ সেঁকো বিষ ২৫ তোলা এবং আবশ্যক মত জল।

২। হেনরো আধপোয়া, সরিষার খৈল ৮ সের, পচা মৎস্য ৪ সের, বচ বা আকন্দমূল চূর্ণ ২ সের, সমস্ত একত্রে আবশ্যকমত জলে মিশাইয়া তরল পঙ্কবৎ করতঃ অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে ইক্ষুদণ্ড তাহাতে ডুবাইয়া পরে ভূমিতে রোপণ করিতে হইবে।

৩। শাখা পত্রাদি সহিত বাসক পত্র সিদ্ধ করতঃ তাহাতে সরিষার খৈল মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ ব্যবহার্য্য।

৪। সেঁকোবিষচূর্ণ ১ তোলা, খানিকটা ময়দা ও গুড় একত্রে মিশাইয়া বড় বড় গুলি পাকাইয়া নারিকেলের মুচিতে ভরিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে রাখিয়া দিলে, গুড়ের গন্ধে আকৃষ্ট কীটাদি তাহা খাইয়া মরিয়া যায়; উই ও পিপীলিকা নিবারণের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

৫। খোল, হেনরো এবং অধিক পরিমাণ সরিষার খৈল

একত্রে জল মিশাইয়া ঘন লেইবৎ করতঃ ইক্ষুদণ্ড ডুবাইয়া রোপণ করিলে উই নিবারিত হয়; মধ্য ভারতবর্ষে এখনও এই আদির উপায় প্রচলিত আছে।

৬। তুতিয়া /।০ পোয়া, হিং ২॥০ তোলা, সূক্ষ্ম সেঁকো বিষ /৵০ পোয়া, মুসব্বর /১০ পোয়া, ঝুল /১ সের, ছাই /২ সের, চূর্ণ সরিষার খৈল ১/॥০ দেড়মণ ও জল ২/ মণ একত্র মিশ্রিত করতঃ ইক্ষুদণ্ড ডুবাইয়া রোপণ করিলে সর্ব্ববিধ কীট নিবারিত হয়। ইহাতে ৪।৫ বিঘা জমি রোপণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। খৈল সংযোগ বশতঃ ইহা শীঘ্র নষ্ট হয়, অতএব ইহার সদ্য ব্যবহার করা উচিত।

৭। এই মিশ্রিত দ্রব্য হইতে সেঁকো বাদ দিয়া ইক্ষুদণ্ডে পোছড়া লাগাইয়া ধোসা পোকা নিবারিত হয়। ধোসা পোকা লাগিলে ইক্ষুদণ্ডে পিপীলিকা আশ্রয় করতঃ ফোঁপরা করিয়া ফেলে। এজন্য ঝাড়গুলি উঠাইয়া পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর অন্য ঝাড়ে সংক্রামিত হইতে পারে না। ধোসা আক্রান্ত ইক্ষুগুলির বৃদ্ধির হ্রাসের সহিত রসও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ধোসা পোকা নিবারণের জন্য ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে অড়হরের বেড়া দিবার প্রথা আছে; ইক্ষু রোপণের পূর্ব্বে সীম, ধঞ্চে, কলাই প্রভৃতির শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করিলেও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে।

৮। সোড়া (Soda Bi-carb) এর জল দিয়া ইক্ষুদণ্ডে পোচড়া লাগাইয়া ধসা ও অন্যান্য কীট নিবারিত হয়।

১৫। আব হাওয়া—ইক্ষু চাষের জন্য কি প্রকার আব-হাওয়ার প্রয়োজন তাহা সম্যকরূপে অবগত হইতে হইলে, জগতের যে সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু চাষ হয় সেই সকল দেশের আব-হাওয়া পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই ইক্ষু চাষ ভাল হয়। ভারতবর্ষ, ফিজি, যবদ্বীপ, লোনিদিয়ান, মরিসাস্, কুইন্সল্যাণ্ড ও সিদ্ধি পেরু, পোটোরিকা, ব্রেজিল, মিশর প্রভৃতি স্থানে ইক্ষু চাষ বহুপরিমাণ হইয়া থাকে।

১৬। রৌদ্র তাপ ও আর্দ্র বায়ু—এই দুইটী ইক্ষু চাষের নিতান্ত প্রয়োজন। অনাবৃষ্টি ও শুষ্ক বায়ু ইক্ষুর পক্ষে অনিষ্টকর।

১৭। আখ মাড়া—ইক্ষুরস বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে লৌহের সংস্পর্শে দোষনীয় হয় কিনা? বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বে কাঠের ঘানিতে আখ মাড়া এবং মাটীর হাঁড়িতে গুড় তৈয়ার করা হইত। এই ৪০।৫০ বৎসর হইতে লোহার কলে আখ-মাড়া এবং লোহার কড়াইতে গুড় তৈয়ার হইতেছে। ইহাতে গুড়ের অনিষ্ট হইতেছে কিনা, আখ হইতে যে পরিমাণ রস বাহির হওয়া উচিত, এবং রস হইতে যে পরিমাণ গুড় এবং গুড় হইতে যে পরিমাণ চিনি প্রস্তুত হওয়া উচিত, লোহার কল ও কড়াই হইয়া

উপকার কি অপকার হইয়াছে ? পাঞ্জাব প্রদেশে ৺সিঞ্চিন সাহেব একবার ইহার পরীক্ষা করেন।

১। লোহার কল ও কাঠের কল পাশাপাশি বসান হয় এবং তুইবার করিয়া একই আখ-মাড়া হয়। প্রথমবার মাড়ায় আখের গায় যে সকল ময়লা থাকে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। সুতরাং দ্বিতীয় বারে যে রস বাহির হয় তাহা অধিক পরিষ্কার। একই স্তূপ হইতে দুই কলের আখ যোগান হইয়াছিল। উভয় কল একই সময়ে চালান হয় এবং একজন অভিজ্ঞ লোকদ্বারা উভয় প্রকার রস জ্বাল দেওয়া হয়। প্রত্যেক কলে প্রথম চারি ঘড়া রস বাহির করিয়া পুনরায় ঐ পেষিত আখ কলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বারের রস প্রথমবারের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা ছাঁকিয়া লওয়া হয়। এক হাঁড়ির রস অন্যটীতে লইয়া যাওয়া হয়। এই প্রকারে শেষ হাঁড়ি হইতে ছোট ছোট কলসীতে গাঢ় রস ঢালা হয়।

কল হইতে যখন রস বাহির হয় তখন তাহার গাঢ়ত্ব পরীক্ষা করিয়া তুলনায় দেখা যায় যে—

লোহার কলে	প্রথমবারের রস	১৫
ঐ	দ্বিতীয়বারের রস	১৬
কাঠের কলে	প্রথমবারের রস	১৪
ঐ	দ্বিতীয়বারের রস	১৫

দেড়মাস পরে গুড় পরীক্ষা করা হয়। কোন গুড়ে চুণ দেওয়া হয় এবং কোনটায় তাহা দেওয়া হয় না। সুতরাং দুই

কলে এবং প্রণালীতে ৪ চারি প্রকার গুড় হয়। মান্দ্রাজের রসায়নবিদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহাতে—

	লোহার কলে।		কাঠের কলে।	
	চুণ দিয়া	চুণ বিনা	চুণ দিয়া	চুণ বিনা
চিনি ...	৮৮·১০	৮০·০০	৯০·৬০	৯৭·২০
রাব ...	৫·০৩	৯·৪৪	৩·৬৫	৮·০৯
জল ...	৩·২২	৬·৫২	২·৫২	৭·৪২
ভস্ম ...	১·৩২	১·৭৭	১·২০	·৮৮
একুন ...	৯৭·৬৭	৯৭·৭৩	৯৭·৯৭	১১৩·৫৯

যে গুড়ে চূনের জল দেওয়া হয়। তাহাতে জলের ভাগ কম ছিল, কিন্তু যাহাতে চুণ দেওয়া হয় নাই, তাহার কলসীর গাত্র ভিজিতে দেখা যায়। কাঠের কলে তৈয়ারী গুড়, লোহার কলে তৈয়ারী গুড় অপেক্ষা কোন কোন অংশে ভাল ছিল, অথচ তাহাতে রাবের অংশ কম। লোহার কলের গুড় সহজে দানা বাঁধে এবং রাব সহজে বাহির হইয়া আসে। কিন্তু কাঠের কলের গুড়ে তাহা হয় নাই। গুড় জ্বাল দেওয়া দোষেও এই প্রভেদ হইতে পারে। চূণ দেওয়া গুড উভয় স্থলেই ভাল; ইহাতে সহজে দানা বাঁধে এবং রস সহজে বাহির হইয়া যায়। লোহার কলে গুড়ের দানা অপেক্ষাকৃত অধিক মিহি এবং রং গাঢ়।

সকল অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে লোহার

কলে রস বেশী বাহির হইলেও কাঠের কলে গুড় বেশী হয়। বেশী কঠিন করিয়া মাড়া হইলে রসে ময়লা বেশী হয়, এবং অম্লত্ব জন্মে; তাহাতে রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। একই পরিমাণে চুণ দেওয়া হয় তথাপি লোহার কলের রসে অম্লত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না। তাহাতে রাবের পরিমাণ বেশী হয়। যে গুড়ে চুণ একেবারে দেওয়া হয় নাই। তাহাতে রাবের পরিমাণ আধিক্য হইতে প্রমাণ হইবে যে অম্লত্ব, চুণ দ্বারা দূর করা হয়।

গুড়ের বর্ণ গাঢ় হইলে তাহার আদর কম। লোহার কলের গুড়ের বর্ণ গাঢ়। এইজন্য গঞ্জাম প্রদেশের চিনি প্রস্তুত কারীরা লোহার কল পছন্দ করে না। কিন্তু লোহার কলে যে পরিমাণে সহজে ও সত্বর রস বাহির হয়, কাঠের কল হইতে সেই ফল পাওয়া যায় না। তবে Tea-rolling machine অর্থাৎ চার পাতা মাড়াইবার জন্য লোহা যেমন হাল্কা কাঠ দিয়া মোড়া হয়, যদি আখ মাড়া লোহার কলেও ঐরূপ করা হয়, তবে আখের রস লোহার সম্পর্কে আসে না। আবার বাঙ্গলা দেশে যে রস জ্বাল দিবার জন্য লোহার বড় বড় কড়াই হইয়াছে, এই লৌহ সম্পর্কও গুড়ের পক্ষে অনিষ্টকর। মাটির হাড়িতে রস জ্বাল দেওয়া তত সহজ নয়। এই সকল বিবেচনা করিলে কাঠ ও লোহা উভয়েরই সুবিধা ও অসুবিধা আছে। যদি লোহার কল ও কড়াই ব্যবহার করিতেই হয় তবে তাহা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

১৮। চিনির প্রকার ভেদ।

অনেক প্রকার চিনি আছে। যথা,—ফল চিনি, যব চিনি, ইক্ষু চিনি ইত্যাদি।

ফলচিনি, (অঙ্গার ৬, হাইড্রোজেন ১২, অক্সিজেন ৬)। ফলের মধ্যে যে চিনি পাওয়া যায় তাহাকে ফলচিনি কহে। ফলচিনি দুই প্রকার, যথা—(১) গ্লুকোষ্ বা ডেক্সট্রোষ, (২) লেভুলোষ। ডেক্সট্রোষ্ অতি স্বল্প মিষ্ট বিশিষ্ট শর্করা, কিন্তু লেভুলোষ্ ইক্ষু শর্করার ন্যায় মিষ্ট। মাতগুড় ও মধুতে অধিকাংশই লেভুলোষ কিন্তু ফলে ইক্ষু চিনিও সাধারণতঃ পাওয়া যায়। ফলচিনি হইতে সুরা প্রস্তুত হয়।

পালো সালফিউরিক এসিডের ক্ষীণ দ্রাবনের সহিত উত্তাপ দিলে ফলচিনিতে (ডেক্সট্রোষ্) পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার অম্লত্ব নষ্ট করিবার নিমিত্ত চাখড়ি চূর্ণ সংযোগ করা আবশ্যক। তাহার পর, এই রসকে ফ্লানেলে অথবা ব্লটিং পেপারে ছাঁকিয়া পুনঃ উত্তাপ দিয়া গাঢ় করিলেই, ফলচিনি প্রস্তুত হয়।

ডেক্সট্রোষ্ ফল ব্যতীত ডিম্বে, জন্তুর যকৃতে এবং বহুমূত্র-রোগীর মূত্রে পাওয়া যায়। ইক্ষু শর্করা সাল্ফিউরিক্ এসিড্ যোগে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু ডেক্সট্রোষ তাহা হয় না।

যবচিনি (মলটোষ্) দুগ্ধ চিনি (ল্যাকট্রোষ) এবং ইক্ষু চিনি (সুক্রোষ্), (অঙ্গার ১২, হাইড্রোজেন ২২, অক্সিজেন ১১)। এই সকল শর্করাতে সমসংখ্যক অঙ্গার হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন

আছে। কিন্তু ইহাদের গঠন প্রণালী বিভিন্ন; এইজন্য ইহাদের গুণাবলীও বিভিন্ন।

ইক্ষুচিনি।—ইক্ষুচিনি ও খেজুর চিনি উভয়কেই আমরা ইক্ষুচিনি বলিয়া বর্ণনা করিব; বাস্তবিক ইহাদের গঠন প্রণালীও একইরূপ কিন্তু আমরা গন্ধ ও স্বাদ দ্বারা এই উভয় চিনিকে বিভক্ত করি; তাহার কারণ এই যে, প্রস্তুত করিবার সময়ে বিশুদ্ধ শর্করা ব্যতীত অন্যান্য অনাবশ্যক পদার্থ ইহাদের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে চিনি প্রস্তুত করিবার একটী সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল।

ইক্ষুর রস বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ ফ্লানেল দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে কলিচুণ (১) এমনভাবে মিশ্রিত করিবে যেন ইহা এই রসের অম্লত্ব নষ্ট করিতে পারে (২) নীল বর্ণের লিটমাস কাগজ এই রসে ভিজাইলে যদি ইহা লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে রস অম্লযুক্ত। তাহা হইলে আরো চুণ মিশ্রিত করিতে হইবে। যখন দেখিবে যে, লোহিত বর্ণের কাগজ কিঞ্চিৎ নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন জানিবে যে চূণ মিশান ঠিক হইয়াছে। পরে কড়াতে রস জ্বাল দিবে। এই রস উত্তপ্ত হইলে, ইহার সাহিত (৩) সালফিউরিক এসিড্ দ্রাবণ মিশ্রিত করিবে, যেন নীল লিটমাস্ কাগজ ঈষৎ লোহিত বর্ণ ধারণ করে। যদি চূণ অতিরিক্ত হইয়া থাকে, তবে লোহিত বর্ণের কাগজ নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইবে; তাহা হইলে আর একটু সালফিউরিক এসিড্ মিশ্রিত করিতে হইবে। চূনের ভাগ অপেক্ষা এসিডের

ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক রাখিবে; চুনের ভাগ অধিক হইলে গুড়ের বর্ণ নিশ্চয়ই কাল হইবে। কিছু সময় জ্বাল দিলে রসের দ্রবনীয় অনেক পদার্থ কঠিনাকার ধারণ করে। তখন রস নামাইয়া কিছু সময় মৃত্তিকা বা কাঠের পাত্রে রাখিলে, রসের ময়লা নীচে পড়ে। ছাকিয়া পুনরায় জ্বাল দিলে, বিশুদ্ধ গুড় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে পুনরায় কিঞ্চিৎ সাল ফিউরিক এসিড যোগ করিলে রসের কৃষ্ণবর্ণ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। কিন্তু আমি নিজে রস জ্বাল হইতে কচি সিমুল গাছের শিকড়ের রস দিয়া দেখিয়াছি গুড় অতি সুন্দর পরিস্কার হয়। এই প্রণালীতে গুড় তৈয়ার করিলে, অধিক দানাদার গুড় পাওয়া যায়। এবং গুড়ের রং পরিস্কার সাদা হয়, এই গুড় শীঘ্র মাদাইয়া যায় না।

উড়িষ্যা দেশে কৃষকেরা কলিচূণ ও কাচা দুধের সাহায্যে রস জ্বাল দিবার সময় গাদ কাটিয়া গুড় পরিস্কার করে। বিহারের কৃষকেরা লিচরা ফলের আঠা বা পাতার রস দিয়া গাদ কাটে। গাদ না কাটিলে গুড়ের রং কালো থাকে কম দামে বিক্রয় হয়। গুড় জ্বাল দেওয়া কড়াই সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে যেন গুড় না পুড়িয়া যায়। গুড় হইবার পূর্ব্বে সোডার জল দিলেও গুড় পরিস্কার হয়। গুড়ের মাদ বাহির করিয়া দিলে চিনি হয়, অতি উত্তম চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে গুড় জলে গুলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে চূণ ও সালফিউরিক এসিড যোগ করিয়া দানাদার গুড় প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। রস, কয়লা ও

চূণের ভিতর দিয়া ফিল্টার করিয়া লইলে চিনির বর্ণ অতিশয় উজ্জ্বল হয়। কেহ কেহ সালফার ডায়ক্‌ট সাইড্‌ দ্বারা (গন্ধক পোড়াইলে যে ধূম উত্থিত হয়) রসের বর্ণ নষ্ট করিয়া থাকেন। এই রস ভ্যেকুয়াস কড়াইতে গাঢ় করিয়া চিনি প্রস্তুত করিলে খুব সাদা বড় বড় দানা বিশিষ্ট চিনি হয়।

১৯। কাটাই মাড়াই।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে আক লাগাইলে পরবর্ত্তী পৌষ মাঘ মাসে আক কাটিবার সময় হয়। যে সকল আকে ফুল হয় তাহাদের ফুল বাহির হইলেই জানিতে হইবে আক পাকিয়াছে। অন্যান্য জাতের আকের পাতা যখন হরিদ্রাভ হয় ও উপরকার পাতার অগ্রভাগ শুকাইয়া আসে, তখন বুঝিতে হইবে আক পাকিয়াছে।

আক কোদালি দ্বারা দুই এক ইঞ্চি মাটির নিম্নে কাটা হয় এবং আন্দাজ এক মণ করিয়া বাণ্ডিল বাঁধিয়া মাড়াই কলের নিকট লইয়া যাওয়া হয়।

বাঙলার কৃষকেরা সাধারণতঃ দশ জনে মিলিয়া রেণিফ কোম্পানীর তিন রোলার কল ও "চিতরী" চতুষ্কোণ কড়াই ভাড়া করিয়া আক মাড়াই করে।

যেখানে খুব বেশী আকের আবাদ আছে, তাহারা যেন একটী আক মাড়াই ইঞ্জিন চলতি কল খরিদ করেন এবং হাদী সাহেবের

উদ্ভাবিত চুলা ও কড়াইএ গুড় জ্বাল দেন। যে স্থানে আকের আবাদ কম সেখানে "ম্যাগ্নেশাম" সাহেবের প্রদর্শিত চূলায় রস জ্বাল দেওয়াই ব্যবস্থা এবং স্থানীয় এগ্রিকালচারাল অফিসার মহাশয় তাহা সম্যকভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন।

২০। বাংলার ৭॥০ কোটী টাকা রক্ষার উপায়।

আমাদের চিনি যোগাইতেছে যাভা। এমন একদিন ছিল যখন দেশী চিনি প্রচুর পরিমানে হইত, এবং তখন আকের চাষও বেশ ছিল। বর্ত্তমানে যাভা সুবিধায় আকের চাষ করিয়া সস্তায় চিনি যোগাইতেছে ফলে আক চাষে বাংলা দেশ যাভার নিকট পরাস্ত হইয়া ক্রমশঃ আকের চাষ ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন বাংলা যাভার নিকট হইতে প্রতি বৎসর ৭॥০ কোটী টাকার চিনি কিনিয়া থাকে। আমরা একটু চেষ্টা করিলেই এই ৭॥০ কোটী টাকা ইক্ষু চাষ দ্বারা দেশে রাখিতে পারি। আমাদের দেশেই যাহাতে সুবিধা দরে চিনি প্রস্তুত হইতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। উন্নত প্রণালীর কলের দ্বারা আক মাড়াই করিবার জন্যও গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ধনী ব্যক্তিগণ বা সমবায় সমিতি এই কাজ করিবেন। আর যাঁহারা আক চাষ করিবেন, তাহারা সেই আক ঐ কারখানায় বিক্রয় করিবেন। ইহাতে কৃষকদের এই সুবিধা হইবে যে আক মাড়িতে তাহাদের যে অর্থব্যয় কষ্ট ও সময় নষ্ট হয়, তাহা আর হইবে না

বরং ঐ সময়টা তাহারা অন্য চাষ করিতে পারিবে। এই সময়ে ধান ঝাড়ার কাজ বা রবিশস্য উৎপাদনের কার্য্য হইতে পারে। এইরূপ চিনি প্রস্তুতের এক একটী কেন্দ্র থাকিবে। সেই কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে এক বা দুই মাইল ব্যাপিয়া ৬ শত বিঘা পর্য্যন্ত আক চাষ থাকিবে। গত দশ বৎসরে গড়ে বাৎসরিক ৩ লক্ষ টনের অধিক বাংলা দেশে এই টাকার চিনি সহজেই উৎপন্ন করা যাইতে পারে; একমাত্র আকের ও খেজুর গাছের চাষের উন্নতি দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারে। কৃষি বিভাগ হইতে সি, ও ২১৩নং নামে এক আক প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে, ইহাতে বেশী গুড় পাওয়া যায়। এক এক কেন্দ্রে যদি ৬ শত বিঘা জমিতে আক চাষ হয়, তা হ'লে একএকটী চিনির কারখানা চলিতে পারে। বাংলা দেশে জমির অভাব নাই। অনেক অনাবাদী জমি পড়ে আছে। পৃথিবীতে যত পাটের দরকার বাংলা দেশ তাহা সরবরাহ করিয়া থাকে একবার একটু বেশী দর পাইয়া কৃষকেরা টাকার লোভে প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমিতে পাট বেশী চাষ করায় জগতের চাহিদা অপেক্ষা উৎপন্ন পাট বেশী হওয়ায় দর কমিয়া গিয়াছে; এখন যদি তাহারা ১৫ লক্ষ একর উচু জমিতে (চুচুড়া সবুজ পাটের জমিতে) তাহারা আকের চাষ করে তবে সেই আক হইতে উৎপন্ন চিনির দ্বারা বাংলা দেশের ৭৷৷০ কোটী টাকা বাংলায় থাকিয়া যাইবে। ক্ষেত্র উৎপন্ন সামগ্রী সৎব্যবহারের নাম শিল্প, আকের সৎব্যবহারের নামই চিনি শিল্প।

সমাপ্ত

গ্লোব নার্শরী হইতে প্রকাশিত

কৃষি-পুস্তকাবলী

১। **সরল কৃষিকথা**—সমগ্র বাংলার অনায়াস লভ্য বৃক্ষলতা ইত্যাদির চাষ ও তদুৎপন্ন শিল্পের দ্বারা ভদ্রপরিবারের অন্ন সমস্যা লিপিবদ্ধ আছে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

২। **বাংলার শাকসব্জী**—যাবতীয় দেশী ও বিদেশী সব্জীর চাষ আবাদ প্রণালী, সার দেওয়া প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

৩। **তুলার চাষ**—এনোফিলিস মশার আবাসভূমি পল্লিগ্রামের উচ্চ জমিগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলার গাছ লাগাইয়া আবার যাহাতে ঢাকার মসলিনের ন্যায় সূতা প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৪। **আলুর চাষ**—বাংলাদেশে ভাদুই ফসল উঠিয়া গেলে যে সকল জমিতে এই লাভ জনক কৃষি সহজ উপায়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নত সার ও বীজের সাহায্যে সাধারণ লোকে চাষ করিয়া লাভবান হইতে পারিবেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৫। **কলার চাষ**—"৩৬০ ঝাড় কলা রুয়ে, থাকগে চাষী খাটে শুয়ে"—এই কথাটির সার্থাকতা করিবার জন্য কলার স্থান, সময়, রোপণ প্রথা, তদ্বির ও চিকিৎসা, কলা হইতে আটা, মধু জেলী, কালী, বাতী, সিরাপ, সূত্র ইত্যাদি প্রস্তুপ প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৬। **বেনেতি বাগ**—খাদ্য শস্য অপেক্ষা পণ্য শস্য যে অধিকতর লাভ জনক এই পুস্তক দৃষ্টে তাহাই বুঝিতে পারিবেন। আদা, আমআদা, হরিদ্রা শটী, পিপুল ইত্যাদির বিষয় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৭। **ইক্ষু চাষ**—বাংলার উচ্চ জমিতে কোন কোন জাতীয় ইক্ষু বৈজ্ঞানিক সার ও উন্নত কৃষির সহায়তায় লাভবান হওয়া যায়—তাই বর্ণিত আছে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।